ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ।। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৪ মে, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

হত্যালীলা চালাতে লস্করের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হায়দরাবাদ পুলিশের হাতে ধৃত লস্কর-এ-তৈবা জঙ্গি মহম্মদ জিয়া উল হকের কাছে পাকিস্তান থেকে আসা একটি চাঞ্চল্যকর ই-মেল সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে। যে ই-মেলে হক-কে ভারতে তার ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে তার নামে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখার কথাও সেই ই-মেলে উল্লিখিত হয়েছে। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীম (সিট)-এর এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, হক এব্যাপারে তাঁদের কাছে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, হায়দরাবাদে জঙ্গি হানার ঘটনার মূল অভিযুক্ত ছিলেন এই মহম্মদ হক-ই। দু'টো হ্যান্ড গ্রেনেড, অস্ত্র-শস্ত্র এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলসমেত গত ৩ মে এডিবাজার থেকে বমাল ধরা পড়ে হক। পুলিশ কাস্টডি-তে আসার পরে পাক-নিবাসী জনৈক আব্দুল আজিজের কাছ থেকে বেশ কিছু ই-মেল আসে তার কাছে, যাতে ভারতবিরোধী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ছিল। গোয়েন্দারা তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন, ধরা পড়ার আগে এই ই-মেলের আদান-প্রদানের জন্য হক রেন-বাজার ও মেহেদিপটনম এলাকায় গত একমাস ব্যাপী একটি সাইবার কাফেকে ব্যবহার করছিল। গোয়েন্দারা ওই কাফের চারটি কম্পিউটারকে আপাতত বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং পরীক্ষার জন্য তা ফরেন্সিক ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে হক একথাও জানিয়েছে যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তার যে ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টগুলো রয়েছে তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত আছে। গোয়েন্দারা এই বিপুল অর্থের উৎসটাকেই খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন এবং তাঁরা মনে করছেন একজন সামান্য গাড়ীচালক হক এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন 'হাওলা' বা ওই জাতীয় কোনও অবৈধ উপায়ে যার মধ্যে ভারতীয়দের ওপর হামলা চালানোর পারিশ্রমিক যুক্ত হওয়াও কোনও বিচিত্র ব্যাপার নয়। ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টগুলোতে অর্থ আদান-প্রদানের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার পাশাপাশি হকের অন্তত চারটি মোবাইল সিম কার্ডের হদিশ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। যে সিমকার্ডগুলো থেকে বিদেশে বিশেষ করে সৌদি আরবের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রাখত সে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৫ সালে সৌদি আরবে গিয়েই লস্করের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে মহম্মদ জিয়া উল হক। তার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে তাই পেট্রো-ডলারের বিপুল অর্থসম্ভার থাকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারছেন না বিশেষভাবে একাজে নিযুক্ত গোয়েন্দারা। জানা গিয়েছে পুলিশ কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে গোটা দু'য়েক জাল পাসপোর্টও হাসিল করেছিল সে। ২০০২ সালে গোধরা কাণ্ডের সময় লস্করের নির্দেশে হক ভারত থেকে পাকিস্তানে ফিরে যায় এবং

(এরপর ৪ পাতায়)

হায়দরাবাদে ধৃত জঙ্গির জবানবন্দী

মহাপ্রস্থানে ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৫ মে, শনিবার সকাল ১১-১০ মিনিটে জয়পুরে সোয়াই মান সিং হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত। তিনি ছিলেন একাদশতম উপরাষ্ট্রপতি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। রাজস্থানের শিকর জেলার কাছারিয়াবাস নামে এক অখ্যাত গ্রামে ১৯২৩ সালের ২৩ অক্টোবর ভৈরোঁ সিং-এর জন্ম। তাঁর মৃত্যুসংবাদে দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজস্থানে ভৈরোঁ বাবা বা বাবে সা নামে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। দলগত রাজনীতির ঊর্দ্ধে ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুকে 'বিরাট ক্ষতি' বলে মন্তব্য করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি হাসপাতালে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে যান।

(এরপর ৪ পাতায়)

মুসলিম ভোটের টানেই মমতার পদবী ত্যাগ

।। গুঢ়পুরুষ।। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ঘোষণা করেছেন তিনি তাঁর 'বন্দোপাধ্যায়' পদবীটি বর্জন করেছেন। তবে আপাতত এই বন্দোপাধ্যায় পদবী বর্জন পশ্চিমবঙ্গের এবং অন্যান্য রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের জন্য। বাংলা লেখায় তিনি এখন শুধুই মমতা। দেশের অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে আপাতত তিনি 'মমতা ব্যানার্জী' থাকছেন। মমতা নিজেই সাংবাদিকদের বলেছেন, ''পদবীকে এক জঘন্য খেলা ছাড়া আর কিছু বলেই মনে হয় না আমার।'' তাঁর এই পদবী বর্জনের প্রথম পদক্ষেপে তিনি রেলমন্ত্রীর সরকারি লেটারহেডে বাংলায় শুধু 'মমতা' লিখছেন। লেটারহেডে ইংরাজি, হিন্দি ও উর্দুতে অবশ্য লেখা হচ্ছে 'মমতা ব্যানার্জী'। তবে আগামী বিধানসভার নির্বাচনের আগেই 'ব্যানার্জী' 'বন্দ্যোপাধ্যায়' সবই তিনি পরিত্যাগ করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

যে কোনও নির্বাচনের আগে চমক দেওয়ায় তৃণমূল নেত্রীর একটি সহজাত প্রবণতা আছে। তা সে পুরসভা থেকে লোকসভার নির্বাচন যাই হোক না কেন। সেই 'চুপচাপ ফুলে ছাপ' স্লোগান থেকে সাম্প্রতিককালে 'মা-মাটি-মানুষ' সবেতেই মমতার এই নির্বাচনী চমক দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৮১টি পুরসভার নির্বাচনের মুখে তাঁর পদবী বিসর্জন দেওয়ার চমকপ্রদ ঘোষণায় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অন্য উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটদাতাদের কাছে মমতা বার্তা দিতে চেয়েছেন, 'আমি তোমাদেরই লোক। হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলা নই'। পশ্চিমবঙ্গে ভোটদাতাদের ২৬ শতাংশ মুসলিম এবং অন্য অহিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটার ১ শতাংশ। এই মোট ২৭ শতাংশ ভোটদাতাদের মন

পেতেই তিনি তাঁর বন্দোপাধ্যায় পদবীটি বিসর্জন দিয়েছেন। মমতা অবশ্য তা মানতে চান না। তিনি বলেছেন, 'আমার কোনও জাত ধর্ম নেই। আমি একজন শুধুই মানুষ'।

মমতার এই নির্বাচনী চমকে আতঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা। বিশেষভাবে সিপিএম। জাত, গোত্র, ধর্মকে যারা বুজরুকি বলে মনে করে। এই বাঙালি কম্যুনিস্টরা এতকাল বলে এসেছেন জাত, ধর্ম, বর্ণ এসব কিছুই দরিদ্র সর্বহারাদের দাবিয়ে রাখার

(এরপর ৪ পাতায়)

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথেরাও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিনিধি।। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্বাধীন দ্বিখণ্ডিত ভারতের ছ' দশক পার করে, দেশের সাংবিধানিক সত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এখন এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। একথা সকলেই জানেন কেবলমাত্র সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক গড়ার লক্ষ্যেই রাজ্যসরকারের এই অসাংবিধানিক, আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ বাংলায় এই প্রথম নয়। ১৯৩৮ সালে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা প্রথম এই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লিগের এই সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক সিদ্ধান্তের কঠোর নিন্দা করেছিলেন সে সময়ের জাগ্রত হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। কে ছিলেন তাঁদের মধ্যে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লর্ড সিংহ প্রমুখ সকলেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সেই অনৈতিক সিদ্ধান্ত অবিলম্বে রদ্ করার জন্য তাঁরা তৎকালীন রাজ্যপালকে দার্জিলিঙে টেলিগ্রামও করেন। সেই টেলিগ্রামের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ সহ প্রতিবেদন তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যকাশে অতীতের সেই নাট্যাভিনয়ের আজ যেন পুনরাভিনয় হতে চলেছে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের পার্থক্য—সেদিনের সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন তৎকালীন বাংলার আপামর বুদ্ধিজীবী মহল। অথচ আজ যাঁরা তথাকথিত বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী তারা সব দেখে-বুঝেও নিশ্চুপ। দ্বিতীয়ত, সেদিনের প্রতিবাদীদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথের সার্ধ জন্মশতবর্ষেই এই ট্রাজেডির পুনরাভিনয়।

নীচে ১৯৩৯ সালের সেই ঐতিহাসিক টেলিগ্রামটি পুনঃ মুদ্রিত হলো—

১৭ মে ১৯৩৯/৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সরকারী চাকুরী বণ্টন
অসঙ্গতভাবে হিন্দু জনসাধারণের
স্বার্থহানির চেষ্টা
সততা ও যোগ্যতার মূলে কুঠারাঘাত
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিবার জন্য
গবর্ণরকে অনুরোধ
রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তার

সরকারী চাকুরীর হার বণ্টন সম্পর্কে গত আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোনও সিদ্ধান্ত না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বাঙ্গালার বহু বিশিষ্ট হিন্দু দার্জ্জিলিংয়ে বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট নিম্নোক্ত তার করিয়াছেন ঃ—

''বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারী চাকুরীর হার বণ্টন সম্পর্কে গত আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, বাঙ্গলার হিন্দু জনসাধারণ তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে অন্যায় ও অসঙ্গত। হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ দাবাইয়া রাখিবার অপচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বত্র আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। হিন্দুদের হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও তাহারা কোন বিশেষ সুবিধার দাবী করিতেছে না। উক্ত প্রস্তাবে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা সম্পর্কে অস্বাভাবিক উপায়ে যে কড়াকড়ি অবলম্বন করা হইয়াছে, বাঙ্গালার হিন্দুগণ

(এরপর ৪ পাতায়)

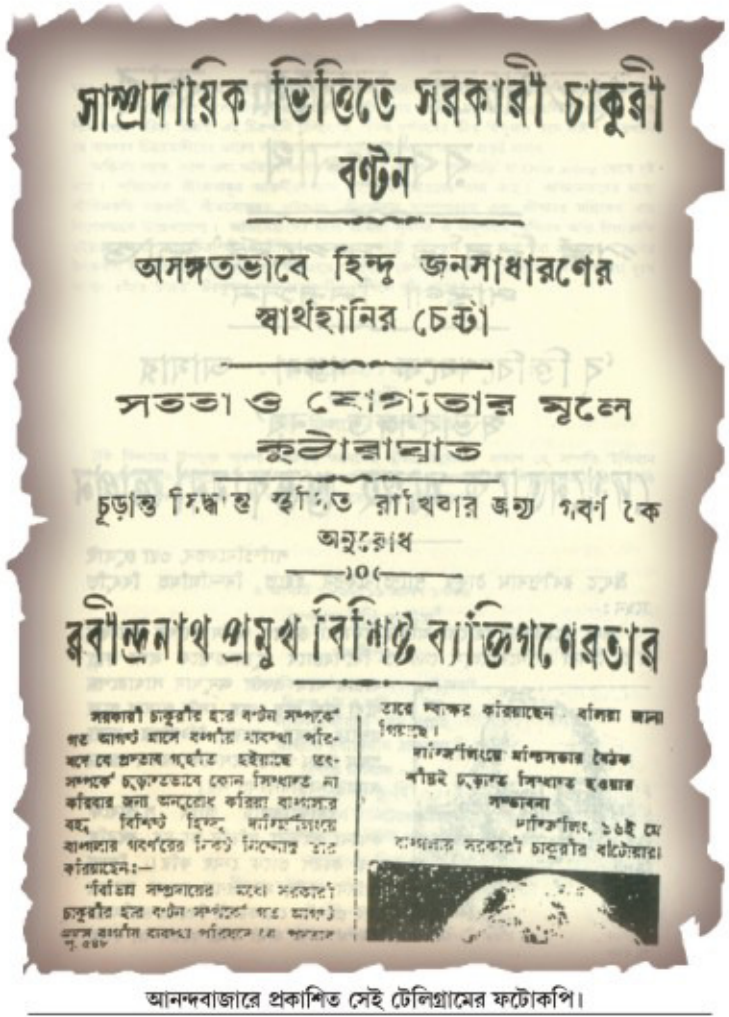

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সরকারী চাকুরী বণ্টন

অসঙ্গতভাবে হিন্দু জনসাধারণের স্বার্থহানির চেষ্টা

সততা ও যোগ্যতার মূলে কুঠারাঘাত

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিবার জন্য গবর্ণরকে অনুরোধ

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তার

সরকারী চাকুরীর হার বণ্টন সম্পর্কে গত আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোন সিদ্ধান্ত না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বাঙ্গলার বহু বিশিষ্ট হিন্দু দার্জিলিংয়ে বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট নিম্নোক্ত তার করিয়াছেন ঃ—

''বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারী চাকুরীর হার বণ্টন সম্পর্কে গত আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, বাঙ্গলার হিন্দু জনসাধারণ তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে অন্যায় ও অসঙ্গত। হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ দাবাইয়া রাখিবার অপচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বত্র আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। হিন্দুদের হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও তাহারা কোন বিশেষ সুবিধার দাবী করিতেছে না। উক্ত প্রস্তাবে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা সম্পর্কে অস্বাভাবিক উপায়ে যে কড়াকড়ি অবলম্বন করা হইয়াছে, বাঙ্গালার হিন্দুগণ তারে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দার্জিলিংয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক
পাঁচই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

দার্জিলিং, ১৬ই মে
বাঙ্গলার সরকারী চাকুরীর বাঁটোয়ারা।

আনন্দবাজারে প্রকাশিত সেই টেলিগ্রামের ফটোকপি।

জোটের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সেমিফাইনালে

ফায়দা লুটবে কে?

তারক সাহা।। পরিস্থিতি পাল্টেছে। সম্প্রতি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিরোধী জোটের প্রত্যয়ে যেভাবে সোনিয়া আঘাত হানলেন মায়াবতীকে সঙ্গে নিয়ে তাতে তাঁর মনোবল আরও বেড়ে গেছে। মমতার গোঁয়ার্তুমির পরিণতি এটাই। এ রাজ্যে ৭৭ সালের পর কংগ্রেসের হারাবার কিছুই নেই। গত এপ্রিল লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের দরকার ছিল মমতার হাত। কিন্তু এই মুহূর্তে সোনিয়ার সেই প্রয়োজনটা ফুরিয়েছে কেননা আবার লোকসভার নির্বাচন ৪ বছর পর। এর মধ্যে দেশের নদীগুলি দিয়ে বয়ে যাবে বহু জল। কেবল বাকি রইল ২০১১-র রাজ্য বিধানসভা। এ রাজ্যে কংগ্রেসের যে হাল তাতে একক প্রচেষ্টায় বিধানসভা যে দখল নেওয়া যাবে না মোটামুটি নিশ্চিত প্রণব-সোনিয়া। কাজেই আগামী বিধানসভায় মমতার সঙ্গে জোট হবে কিনা তা আপাতত শিকেয় তুলে রাখতে চাইছে কংগ্রেস।

সামনে পুরভোট। রাজ্যজুড়ে মোটামুটি চতুর্মুখী লড়াইয়ে অ্যাডভান্টেজ বামফ্রন্ট এটা মোটামুটি সবাই বলবে। এবারে পুর-ভোটে যদি হ্যাং করপোরেশন হয় তবে মোটামুটি তিনটি সম্ভাবনা উঠে আসতে পারে। যেমন, তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু ম্যাজিক নাম্বার নেই, তবে তো সমাধান হয়েই যাবে কংগ্রেসের সহায়তায়। উল্টোটা হলেও সমস্যা নেই। দুই, যদি বামফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু ম্যাজিক নাম্বার নেই, তবে কংগ্রেস কি বামফ্রন্টকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? তিন—যদি এমন হয় কংগ্রেস এক নম্বরে, বামফ্রন্ট দুয়ে এবং তৃণমূল তিনে আর পরিস্থিতিটা এমনই যে বোর্ড গড়তে তৃণমূল নয় বরং বামফ্রন্টকেই দরকার কংগ্রেসের। তাহলে কী করবে কংগ্রেস নেতৃত্ব?

জোট না হওয়ায় এমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম সম্ভাবনা তত্ত্ব বাদ দিলে অস্তিত্ব রক্ষায় বাকি দুটো ক্ষেত্রেই সিপিএম তথা বামফ্রন্ট রাজি হয়ে যাবে। বাকি দুটো সম্ভাবনা যদি বাস্তবায়িত হয় তবে মমতার ভূমিকা কি হবে? সিপিএমকে সাহায্য করতে বা সিপিএমের সাহায্য নিতে কংগ্রেসের কোনও আপত্তি নেই, শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে মমতাকে সে বার্তা পাঠিয়েছেন সোনিয়া। তাহলে কি মমতা সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রে সমর্থন তুলে নেবেন? মমতা সম্ভবতঃ এই অনড় মনোভাবের ফলে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবেন না তো? এই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসবে জনমানসে। মমতা সমর্থন তুলে নিলেও সিপিএম সমর্থন দিয়ে দেবে সোনিয়াকে। সোনিয়া লালু-মুলায়ম-মায়াবতী—এই তিন পরস্পর বিরোধী দলকে সঙ্গে পেয়ে যাবেন। কারণ ওই তিনজনেরই জিওন কাঠি কংগ্রেসের হাতে।

কারণ যেসব দুর্নীতির মামলা রয়েছে ওঁদের বিরুদ্ধে তা স্লো-মোশানে চলবে। সুতরাং বাজপেয়ী জমানায় মাত্র একলাখী দুর্নীতির মামলায় যেভাবে মমতা নিজের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ধরে রাখতে মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে এসে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন, এবারেও হয়ত ভুল করতে চলেছেন তিনি।

২০১১-র মহা-ফাইনালে উঠবেন কিনা তার ফল বোঝা যাবে ২ জুন। যদি কলকাতা সহ বাকি পুরসভায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সিপিএমকে কংগ্রেসের বা উল্টোটার প্রয়োজন হয় তবে মহাফাইনালের দৌড়ে মমতা পিছিয়ে পড়বেন। মমতা এখনও রিজ কাণ্ড বা সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম কাণ্ডে নিজের কৃতিত্বটা ফলাও করে বলছেন বটে, কিন্তু কোনও ইস্যুই এই পুরভোটে কাজে আসবে না। সিঙ্গুরে যেসব জমিহারাদের জন্য টাটা প্রোজেক্ট গড়ে উঠল না তারা কি ফিরে পেয়েছে তাদের জমি? কিংবা তাপসী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তরা জামিনে মুক্ত হয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইজন্য মমতার আন্দোলন কই? কই রিজকাণ্ডের অভিযুক্তরা?

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-রিজ ইস্যুগুলি পুরভোটে ডেড্ ইস্যু। এই ইস্যুগুলি জনমানসে আর ছাপ ফেলবে না। পুরোভোটে প্রধানত পানীয় জল, জঞ্জাল সাফাইয়ের মতো পরিষেবা বহুচর্চিত হয়। কাজেই যে কাউন্সিলার নাগরিকদের ন্যূনতম চাহিদাগুলি ভালভাবে দেখভাল করছেন তিনিই ভোট পান। দলের ব্যাপারটা সেখানে গৌণ।

মানুষ যখন ক্ষমতার গর্বে এতটাই দিশেহারা হয়ে যায় তখন তার চারপাশে স্তাবকদের এক বলয় গড়ে ওঠে—পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটা বহুবার ঘটেছে। আর এই স্তাবকেরা যে দল বা কোনও সংগঠনের যে ক্ষতি করে তা বুঝতে ওই দলের বা সংগঠনের নেতা-নেত্রী তা যখন বুঝতে পারে তখন সব শেষ, কিছুই করার থাকে না। এমনটাই কংগ্রেস কালচারে বহুবার ঘটেছে। '৭৭-র পর থেকে কংগ্রেসে সিপিএমের বহু স্পাই কাজ করেছে। এরা কখনও-ই এরাজ্যে কংগ্রেসের ভোটকে সুসংহত করেনি। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন তলানিতে ঠেকলেও একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে গেছে বামফ্রন্ট। জোরদার কোনও বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে ওঠেনি গত তেত্রিশ বছরে। অন্যান্য রাজ্যে অনবরত শাসক বদলেছে, অথচ ব্যতিক্রম কেবল পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে মমতার ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটছে। মমতার চারপাশে যে সব স্তাবকরা ঘুরঘুর করছে তাদের মধ্যে কেউ সিপিএমের চর নেই তো? মমতার তদন্ত করে দেখা উচিত। নইলে মাত্র ১৫টা সিট কংগ্রেসকে ছেড়ে দিতে পারত তৃণমূল। রাজনীতিতে স্থিতিস্থাপক হওয়া খুব জরুরী অন্তত জোট রাজনীতি যখন এদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতির ভাষা।

কংগ্রেসী নেতারা মহাফাইনালে জোটের ব্যাপারে আশাবাদী হলেও বিষয়টা অতটা সরল নয়। 'মর্নিং শোজ-দ্য ডে'—এই আপ্তবাক্যটি স্মরণে রাখা উচিৎ। যদি এবারের ৮১টা পুরভোটে তৃণমূল ওয়াকওভার পেয়ে যায়, কংগ্রেসের স্থান যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে নেমে আসে তবে তৃণমূলের দাপট আরও বেড়ে যাবে। ২০১১-র মহাফাইনালে এবং সেখানে দরকষাকষিতে পিছু হটতে হবে কংগ্রেসকে, অবশ্য যদি জোট করতেই হয়। যদি উল্টোটা হয় তবে অবশ্য তৃণমূল নমনীয় হবে এমনটাই আশা করা যায়।

পুর নির্বাচনের ফলাফল আগামী দিনের জোট রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। অনেক 'যদি'-র ওপর নির্ভরশীল আগামীদিনের বঙ্গীয় রাজনীতি। কংগ্রেস যদি ভাল ফল করে তবে

(এরপর ১৩ পতায়)

এই সময়

ধূমপান নিয়ে পশ্চাদ্‌পসারণ

আন্তর্জাতিক টোবাকো লবির কাছে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদ্‌পসারণ করতে বাধ্য হলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রক। সিগারেট প্যাকেটের গায়ে ধূমপান সম্বন্ধীয় যে রক্তাক্ত ছবিওয়ালা আবশ্যিক সতর্কীকরণ দেবার কথা ছিল তা ছ'মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ৫ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছিল আগামী ১ জুন থেকে এই সতর্কীকরণ বিধি সকল সিগারেট ও টোবাকো প্যাকেটের গায়ে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু নতুন বিজ্ঞপ্তিতে সরকার বলছে, ১ জুনের পরিবর্তে ১ ডিসেম্বর থেকে এই বিধি প্রযোজ্য হবে। প্রশ্ন উঠছে, জুন থেকে ডিসেম্বর—এই ছ'মাস কি টোবাকো সেবন উপকারী হবে নাকি এই সময় জনসচেতনার প্রয়োজন নেই! আসলে সম্প্রতি আমেদাবাদে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত 'ধূমপানের উপযোগিতা' শীর্ষক কর্মশালা প্রমাণ করছে—আন্তর্জাতিক টোবাকো লবির সামনে মাথা নোয়ালো ইউ পি এ সরকার।

জেহাদী-বেতন বৃদ্ধি

ভারতে যেমন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই কাশ্মিরী জঙ্গিদের বেতন বৃদ্ধি করল পাকিস্তান সরকার! সত্যি, ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ চালানোর হ্যাপাটা তো আর কম কথা নয়। তার ওপর লাইফ রিস্কও আছে। অবাক হচ্ছেন না কি? বিন্দুমাত্র অবাক হবেন না। শুধু জেহাদী জঙ্গি-ই নয়, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের উদ্বাস্তুদের জন্যও ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর খতিয়ানটা দেখে নিন একনজরে—জম্মু-কাশ্মীরে জেহাদরত জঙ্গিদের মাইনে মাসিক ৫০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করা হয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের উদ্বাস্তুদের ভাতাও মাসিক ১৮০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৪০০ টাকা করা হয়েছে। এমনকী, জেহাদী রিক্রুটমেন্টেও বিনিয়োগ বাড়িয়েছে পাকিস্তান।

এরই নাম উন্নয়ন!

উন্নয়ন কারে কয়? সে কি কেবলই যাতনাময়? নইলে ভারতে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ যেখানে গত তেরো-চৌদ্দ বছরে (১৯৯৪-২০০৭) প্রায় ৪১.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমনের খাতিরে ভারত যেখানে বিশ্বের পঞ্চম স্থানটি অধিকার করেছে (আমেরিকা, চীন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান ও রাশিয়ার ঠিক পরেই)। এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই গ্যাস নির্গমনের জন্য অজুহাত হিসেবে খাড়া করা হয়েছে 'উন্নয়ন' নামক বস্তুটিকেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উন্নয়নসূচক 'দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হার' (জি ডি পি)-এর অবনমন ঘটেছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ। বোঝাই যায় কার্বন ঘনত্ব জি ডি পি-র ওপর প্রভাব ফেলেছে। বলাই বাহুল্য, উন্নয়নকামীদের আরও একটু সতর্ক হওয়া উচিত। নচেৎ ভবিষ্যতের উন্নয়ণ আর কিছু নয় কেবল শূন্যগর্ভ আস্ফালনই করতে পারবে।

ফাঁসের মোক্ষম দাওয়াই

প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেই পুনরায় নিতে হবে পরীক্ষা। এমনই আদেশ দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের। বিচারপতি আফতাব আলম এবং কে এস রাধাকৃষ্ণনের বেঞ্চ সম্প্রতি এই রায় জানিয়ে মন্তব্য করেন, পরীক্ষা শুরুর এক মিনিট আগেও যদি প্রশ্নপত্র প্রকাশ্যে এসে পড়ে অর্থাৎ ফাঁস হয়ে যায় তবে তা লিখিত পরীক্ষাকে কলঙ্কিত করার পক্ষে যথেষ্ট। ইতিপূর্বে ২০০৩ সালে ভারতীয় রেল বোর্ডের একটি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। তখন অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের আদেশ দেন। কিন্তু ওই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রেল বোর্ড সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু এই রায় সুপ্রিম কোর্টও তাদেরকে আশাহত করল। সেইসাথে এমন একটি রায় দিল যা পরীক্ষা-নিয়ামকদের আরও সচেতন হতে বাধ্য করবে।

বিকৃত মস্তিষ্ক

বুদ্ধবাবুর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। নিউজ টাইম চ্যানেলে এসে এমনই মন্তব্য 'প্রতিদিন' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক কুণাল ঘোষের। গত ১৬ মে পুরভোটের প্রচার শুরু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলকে কঠোর ভাষায় আক্রমণের জন্যই সম্ভবত এহেন মন্তব্য। তবে এই বিকৃত মস্তিষ্ক সংক্রান্ত দু'টি যুৎসই প্রমাণ দেওয়া হলো। প্রথমত, বুদ্ধবাবু যেখানেই প্রচারে যাচ্ছেন, সেখানেই সিপিএমের ভরাডুবি হচ্ছে। নন্দীগ্রামোত্তর এহেন প্রবাদ-বাক্য গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সূর্যের পূর্বদিকে ওঠার মতোই সত্য প্রতিভাত হবার পরও তাঁর পুর-প্রচারের নিমিত্ত ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন। দ্বিতীয় প্রমাণ—উক্ত সম্মেলনে বিষময় শক্তি হিসেবে তৃণমূলের সঙ্গে মাওবাদী এবং তৎসঙ্গে আর এস এস-কেও (?!) মিলিয়ে রামধনু জোটের জুজু দেখার অসম্ভব কষ্টকল্পিত একটি অনবদ্য প্রয়াস।

ম্যাজিক পিল

আচ্ছা, আপনার বয়স কি একশ' পেরিয়েছে। কি বললেন, ইয়ার্কি মারছি? তার অনেক আগেই পরপারে পাড়ি দেবেন? আরে রামো, খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই নাকি? আপনার সঙ্গে খামোকা ইয়ার্কি মারতে যাব কেন? বিশ্বাস না হলে অধ্যাপক নীর কারজিলাই-এর নেতৃত্বাধীন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকদের সেই দলটাকেই জিজ্ঞাসা করেই দেখুন না। যে দলের নেতা কারজিলাই রয়াল সোসাইটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তাঁর 'ম্যাজিক পিল' নামে যে বস্তুটি আবিষ্কার করেছেন তা গলাধঃকরণ করলে আপনার আয়ু একশ বছর তো হবেই, একশ' পেরিয়েও আপনি যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ এমনকী, আপনার স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকবে। ২০১২-তে এটি বাজারজাত হবে।

খুলল হিথরো

অবশেষে বিমানযাত্রীদের তীব্র উৎকণ্ঠা ও গভীর আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে খুলল হিথরো বিমানবন্দর। গত ১৭ মে হিথরোর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের আরও দু'টি ব্যস্ততম বিমান বন্দর গাটউইক বিমানবন্দর এবং আমস্টরডাম স্কিফল বিমানবন্দরও মুক্ত হলো বিমানযাত্রীদের জন্য। প্রসঙ্গত, কিছুদিন পূর্বে আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল ইউরোপের আকাশ। আইসল্যান্ডগুলো গলতে শুরু করেছিল। নো-ফ্লাই জোন উঠে এসেছিল। সবচেয়ে বড় কথা হাজারখানেক বিমান বেশ ভালরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে যে এত দ্রুত মুক্তি পাওয়া যাবে তা ভাবেননি ইউরোপবাসী। যাই হোক, মুক্তি পেয়ে দম ফেলছে ২৮ হাজার বিমানের পাইলট, কেবিন ক্রু; সেইসঙ্গে বোধ হয় যাত্রীরাও!

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

যে বই না পড়লে না-পড়া থাকে অনেক কিছুই
নীলগ্রীব সিংহ'র
সরওয়ারের তলোয়ার
সাতচল্লিশের স্বাধীনতা লাভের প্রাকমুহূর্তে দুই বাংলায়, কলকাতা শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ভয়াবহ দিনগুলির মর্মান্তিক বর্ণনা উঠে এসেছে ঔপন্যাসিকের কলমে। মুসলিম লীগের জন্ম, তাদের কর্মধারা, দেশভাগের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষের মানুষদের মানসিক টানাপোড়েন, বাসস্থান ছেড়ে চলে আসার যন্ত্রণা, সমকালীন রাজনৈতিক চিত্র স্পষ্ট ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। — বইয়ের দেশ। দাম ১৭০ টাকা।
অমৃত শরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, নবপল্লী, কলকাতা - ১২৬
ফোন ২৫৪২ ৪৩১৯
ঠিকানা লিখে মনিঅর্ডার করুন। বাড়ি বসে বই নিন।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : npssvsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইউ পি এ-দুই সরকারের একবছর

ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স অর্থাৎ ইউ পি এ সরকার তাহার দ্বিতীয়বারের মেয়াদের এক বছর সম্প্রতি পূর্ণ করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউ পি এ সরকারের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য—প্রথম পর্যায়ে বামপন্থীদের সমর্থন ছিল, এইবারে নাই। ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা পর্যুদস্ত হইয়াছে। বামপন্থীদের বিপর্যয় মানে কংগ্রেসের পৌষমাস। গতবারের তুলনায় লোকসভায় কংগ্রেস তাই সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। সঙ্গতভাবেই তাই প্রত্যাশা ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার গতবারের তুলনায় কাজ ভালো করিবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ তো হয়ই নাই, বরং সরকারের মন্ত্রীদের বক্তব্যে ও কাজকর্মে সমন্বয়ের অভাবই বড় বেশী করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিটি বেগুন লইয়া পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশের অনর্থক পদক্ষেপ জনসাধারণের সমালোচনার শিকার হইয়াছে। অন্যদিকে তিনিই আবার চীন সফরের সময় নিজের সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজকর্মের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শশী থারুরের বিভিন্ন মন্তব্য তো সরকার এবং তাহার নিজ দলকে বারংবার অস্বস্তিতে ফেলিয়াছে এবং শেষপর্যন্ত আইপিএল কাণ্ডে দুর্নীতিতে মদত দিবার অভিযোগে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম অস্বস্তিতে রহিয়াছেন। মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলা তিনি যেভাবে করিতে চান সরকার এবং দলের তাহাতে সায় নাই। ইউ পি এ শরিক ডিএমকে-র মন্ত্রী আলগিরি-র তো দিল্লীতে দেখাই পাওয়া যায় না। সংসদে আজ পর্যন্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতেও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। সংসদের অধিবেশনের অধিকাংশ সময়ই তিনি বিদেশে ছুটি উপভোগ করিতে ব্যস্ত থাকেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে ১০০ দিনের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা হইবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্যত তাহারা দেশবাসীকে ঠকাইয়াছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা—'গরীবী হটাও'-এর কথা বহুদিন হইতেই তাহারা বলিতেছেন। কার্যত গরীবী নয়, গরীবরাই শেষ হইয়া যাইতেছে। এক চূড়ান্ত হতাশার চিত্র।

শুধু দারিদ্র্য সীমারেখার নীচের তালিকায় সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি ক্রমশ আকাশছোঁয়া হইতেছে। বিশ্বের ২৫টি দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার যেখানে ২ শতাংশ, সেখানে ভারতে এই হার ১১ শতাংশ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দাম অনেক বেশী। ভ্রান্ত অর্থনীতি এবং শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই এইজন্য দায়ী।

দেশের অন্যতম তদন্ত সংস্থা—সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশান এখন কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনে পরিণত হইয়াছে। এই সংস্থাটিকে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে অপব্যবহার করা হইতেছে। শ্রীমোদী এবং অন্যান্য হিন্দু নেতাদের বিরুদ্ধে এই তদন্ত ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। এইভাবে ইউ পি এ সরকারের হাতে পড়িয়া সিবিআই তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা দুইই হারাইয়া ফেলিতেছে।

ইউ পি এ সরকার এই একবছরের মেয়াদ কালে শুধু নয়, সাধারণ মানুষ বা জাতির কল্যাণে কখনওই কিছু করে নাই। জাতপাত-ধর্ম-সম্প্রদায়ের নামে সমাজকে শুধু ভাগ করিয়া চলিয়াছে। তোষণ নীতির মাধ্যমে ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতিকে মদত দেওয়া হইতেছে। এখন ইউ পি এ সরকার আবার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আপোষের পথে হাঁটিতেছে। আফজল গুরুকে এখনও ফাঁসিতে ঝোলানো হয় নাই। কেন? ইহার কোনও সদুত্তর নাই। এই সরকার সন্ত্রাসবাদীদের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। আজ এদেশে বিধানসভা নির্বাচনে জিতিবার জন্য নকশালবাদীদের সহিত পর্যন্ত কংগ্রেস হাত মিলাইয়াছে।

এক কথায় কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় রহিয়াছে, কিন্তু কার্যত কোনও কিছুই তাহার নিয়ন্ত্রণে নাই। মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে দলীয় 'অন্তরাত্মা'-র কাছেই দায়বদ্ধ। কোনও মন্ত্রীই সংসদে জবাবদিহি করিতে আসেন না। আসলে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যদের শৃঙ্খলা শিখাইতেই পারেন নাই। সেই ব্যর্থতার প্রতিফলনই ইউ পি এ সরকারের সকল কাজেই লক্ষ্য করা যাইতেছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

হৃদয়কে জয় করা, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে মিশিয়ে দেওয়া, ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া, একেই বলে সংগঠন। যদি আমরা আরও বেশি অধ্যয়ন করি, তাহলে বুঝতে পারব যে রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিকে বিলীন করে দেওয়ার মধ্যেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বই আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট এবং অসুবিধার মূল কারণ। ব্যক্তিত্বের বিনাশের অর্থ মৃত্যু নয়, উন্নতিলাভ! তখন আর আমরা ব্যক্তি থাকি না, রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হই। যদি সমগ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা আনন্দিত বা দুঃখিত হই, তাহলে আমাদের কত বিরাট উন্নতি ঘটবে!

—শ্রীগুরুজী

তৃণমূলীরা রাজ্যকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

এন সি দে

বামপন্থী সরকার-চালিত প্রশাসন সম্পূর্ণভাবেই একটি দলীয় প্রশাসন। একথা দেশে দেশে একটি প্রমাণিত সত্য। এই সত্যকে অস্বীকার করার আর কোনও উপায় বামপন্থীদের নেই। বাম-শাসিত রাজ্য কিংবা দেশগুলির মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে এটা জানে। যে কোনও কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বা রাজ্যে সরকারী প্রশাসন মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই একেবারে প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত সরকারি প্রশাসনকে নিরপেক্ষ জনমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একথা সকলেই জানে যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রশাসন চলে দলীয় কর্তাদের কথায়, প্রশাসনিক কর্তাদের কথায় নয়। এর পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রশাসন একান্তভাবেই পরিণত হয়ে পড়েছে দলীয় স্বৈরতন্ত্রের ফাঁসে। ৩২ বছরে এই ফাঁস ক্রমশই জনগণের গলায় চেপে বসেছে। জনগণ তাই এই দলীয় রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে মরিয়া। এই দলীয় রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের অবসানে মরিয়া মুমূক্ষু জনগণের সামনে পরিবর্তনের ললিপপ নিয়ে হাজির হয়ে গেছে সেই চির পরিচিত বিকৃত পচা-গলা কংগ্রেসীদেরই নতুন সংস্করণ "তৃণমূল কংগ্রেস" যাদের পূর্বসূরীরাই ইংরেজ ও মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগসাজশে দেশকে ভাগ করেছিল, যারা হিন্দুস্থানে হিন্দু সংগঠন 'আর. এস. এস'-কে বারবার নিষিদ্ধ করেছে আর মুসলিম লীগকে নিয়ে সরকার চালাচ্ছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারেও রয়েছে মুসলিম লীগ, যারা ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে হিন্দুস্থানের রাজনীতিতে আমদানি করছে ইসলামীকরণ। হিন্দুস্থান ক্রমশ এগিয়ে চলেছে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

আত্মবিস্মৃত হিন্দুসমাজ তার সমাজ, সংস্কৃতির ভয়াবহ পরিণতিতে চিন্তিত নয়, তারা সেই বহুনিন্দিত কংগ্রেসী পরিবর্তনের প্রচারে শিহরিত। চিরকালের সুযোগ সন্ধানী ক্ষমতাসীনদের পদলেহী তথাকথিত বুদ্ধি জীবীরা কংগ্রেসীদের ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে এখন কংগ্রেসী-পরিবর্তনে গা ভাসিয়েছে। হিন্দু সমাজকে ইসলামীকরণের এই ষড়যন্ত্রকে এরা নাম দিয়েছে 'পরিবর্তন'। কী এই পরিবর্তন? কেন এই পরিবর্তন? এই পরিবর্তনের পরিণতি কী?

ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। তৃণমূল নেত্রী প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন যে তারা এই নির্বাচনে জিতলে কলকাতা পৌরসভার মেয়র করবেন এক মুসলমানকে। হিন্দু সমাজে এ নিয়ে আলোড়ন উঠায় সম্প্রতি নেত্রী ছলনার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, এ নিয়ে তিনি পরে বলবেন। কিন্তু জাভেদ খানকে মেয়র করবেন না, এ কথাও স্পষ্ট করে বলেননি। তিনি জয়ের নেশায় মশগুল হয়ে মুসলমানদের নানানভাবে তোল্লা দিয়ে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়েও ঈদের দিনে মুসলমানী পোশাক পরে নমাজ পড়ছেন। সিঙ্গুরে নিজের মঞ্চে মুসলমানদের নমাজ পড়িয়েছেন। হিন্দুর মেয়েকে মুসলমান ছেলে ফুঁসলে নিয়ে গেলেও হিন্দু পিতা তাকে বাধা দিতে পারবে না—টোডি পরিবারকে হেনস্থা করার মধ্য দিয়ে তিনি মুসলমানদের এই ঘৃণ্য কাজকে উৎসাহিত করেছেন। এই কাজে মুসলমানরা এতটাই উল্লসিত হয়ে উঠেছে যে আজকাল খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাচ্ছে যে আদালতের বিচারপতিরাও অম্লান বদনে হিন্দু মেয়ের অপহরণকে বিবাহের বৈধতা দান করছেন। মুসলমান ছেলেরা হিন্দু মেয়েকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই শারীরিকভাবে দুষ্ট করে দিচ্ছে। গোঁড়া হিন্দু সমাজে ফেরার রাস্তা বন্ধ হওয়ায় এই সমস্ত মেয়েরা বাধ্য হয়ে মুসলমান ছেলেকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেই প্রথমেই তারা মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করছে। এর ফলে আদালতে সহজেই অপহরণ মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছে। অপহৃত হিন্দু মেয়ে প্রিয়াংকার পিতাই শুধু নয়, পুলিশ-প্রশাসন কর্তাদের সঙ্গে তৃণমূল ও গণমাধ্যমগুলি এমন মানসিক ও সামাজিক নির্যাতন চালিয়েছে যে এর ফলে আজ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগগুলি হিন্দুনারী অপহরণে কোনও বাধা দেওয়ার কাজে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ যেন বাংলায় সুরাবর্দি শাসন পুনরায় শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হিন্দু নারীর সংখ্যা কমানোর মুসলিমদের এই জৈবিক আক্রমণ পরিকল্পিতভাবে বেড়েই চলেছে।

মমতার দলের উত্থান তাই ইসলামীকরণেরই উত্থান। মমতার উত্থানে আজ মুসলমানরা খুবই উল্লসিত। মুসলিম লীগ তৃণমূলের সক্রিয় সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের তৈরি সাচার কমিশন, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন নামক হিন্দু-নিধন বাণ মমতাকে আরও বেপরোয়া করে তুলেছে। ক্ষমতায় গেলে মুসলমানদের জন্য নানান সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিচ্ছেন। পৌরসভায় মুসলমান মেয়র ঘোষণা যদি সফল হয়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে তার উপর চাপ বাড়বে মুসলমানদের যাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও করা হয় একজন মুসলমানকে। তাহলে বাংলা ভাগের আগে সুরাবর্দি শাসনের সেই কালো দিনগুলির আবার পুনরাবৃত্তি হবে না—কে সেই গ্যারান্টি দিতে পারে? পশ্চিমবঙ্গকে মুসলিম শাসিত বাংলাদেশের অধীনে নিয়ে যাওয়ার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র যে চলছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তবে এবার শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিহার ও অসমেরও কিছু অংশও বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও চলছে। এর বড় প্রমাণ হলো তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলিম নেতারা সম্প্রতি বিহারে তৃণমূল কংগ্রেস গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়েছে। এই কাজে উপস্থিত থেকে সক্রিয় ভাবে নেমে পড়েছেন কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম স্বয়ং। অসমে তো মুসলিম নেতারা সক্রিয় রয়েইছেন। মুসলিম মৌলবাদীরা চিরকালই তাদের ষড়যন্ত্র হাসিল করেছেন বেকুব হিন্দু নেতাদেরই মাধ্যমে। বাংলাভাগের আগে তারা কাজে লাগিয়েছিল যোগেন মণ্ডলের জাতিভেদমূলক তপশিলী জাতির দলকে। এবার তারা পেয়ে গেছে এক নেত্রীকে। কি করছেন তিনি নিজেই জানেন না!

বি.জে.পি.-র পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি রাহুল সিন্‌হা সঠিকভাবেই বলেছেন, মুসলিম তোষণে সি.পি.এম তৃণমূলকে কেবল অনুসরণ করে চলে। এটা ঠিকই যে সিপিএম মুসলিমদের নিয়ে রাজনীতি করেছে কিন্তু কখনই তাদের রাজ্যের মাথায় চড়ে বসানোর কাজটি করেনি; যেটা করছে তৃণমূল। তৃণমূলই তাই বর্তমানে হিন্দু সমাজের শত্রু। হিন্দু ভোটাররা যদি একথা এখনই না বোঝে তাহলে আর বোঝার সময় পাবে না এটা নিশ্চিত। পৌরসভায় ও বিধানসভায় যদি কিছু সংখ্যায় হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সদস্য না যেতে পারে তাহলে তৃণমূলকে সংযত করা যাবে না। সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হোক কিন্তু তৃণমূল যেন পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) না পায়, এটা হিন্দু ভোটারদের নিশ্চিত করতে হবে বিজেপি-কে ভোট দিয়ে। লোকসভা ভোটের মতো বিজেপি এবং সংঘ পরিবারভুক্ত সংগঠনগুলোর বিপুল সংখ্যক ভোটাররা যেন সিপিএম হঠানোর নেশায় মত্ত হয়ে বিজেপি-কে বাদ দিয়ে শুধু তৃণমূলকেই ভোট না দেয়। তাহলে খাল কেটে কুমীরই আনা হবে পশ্চিমবঙ্গে।

সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হোক কিন্তু তৃণমূল যেন পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) না পায়, এটা হিন্দু ভোটারদের নিশ্চিত করতে হবে বিজেপি-কে ভোট দিয়ে। লোকসভা ভোটের মতো বিজেপি এবং সংঘ পরিবারভুক্ত সংগঠনগুলোর বিপুল সংখ্যক ভোটাররা যেন সিপিএম হঠানোর নেশায় মত্ত হয়ে বিজেপি-কে বাদ দিয়ে শুধু তৃণমূলকেই ভোট না দেয়। তাহলে খাল কেটে কুমীরই আনা হবে পশ্চিমবঙ্গে।

মহাপ্রস্থানে ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত

(১ পাতার পর)

শ্রী শেখাওয়াত প্রথমে জনসঙ্ঘ এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সক্রিয় ছিলেন। রাজস্থানের সার্বিক উন্নয়ন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল। ১৯৫২ সাল থেকে আটবার রাজ্য-বিধানসভায় তিনি নির্বাচিত হন। তিনবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। তিনিই রাজ্যে 'অন্ত্যোদয় যোজনা' কার্যকরী করেন। জায়গিরদারি বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর সতত সংগ্রাম স্মরণযোগ্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব ছিল না। সেটা তাঁর ব্যবহারের কারণে। তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানীর সঙ্গে কাজ করেছেন। পিতার অকালমৃত্যুতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য একসময় পুলিশের চাকুরিতে তিনি যোগ দেন। পরে সাব-ইন্সপেক্টরের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে আসেন। ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনেই তিনি দাঁতা-রামগড় আসন থেকে বিজয়ী হন। ২০০২ সালে তিনি ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। সাফল্যের সঙ্গে সেই দায়িত্ব তিনি নির্বাহ করেছেন। অন্ত্যোদয়ের সাফল্যের কারণে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রধান রবার্ট ম্যাকনামারা তাঁকে 'ভারতের রকফেলার' বলে অভিহিত করেন। রাজস্থানী হয়েও তিনি 'রূপকানোয়ার'-এর ঘটনায় সতীদাহের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন।

রাজস্থানে ওয়াকফ্ বোর্ড গঠন এবং আজমীরের খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা সংস্কারের ব্যবস্থা করে মুসলমান সমাজের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পত্নীসহ পরিবারবর্গ। ১৩ মে বুকে শ্বাসকষ্ট অনুভব করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ফুসফুসে সংক্রমণ হয়। পরিণতিতে তিনি ১৫ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৬ মে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এই মহান নেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ —প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানী, সভাপতি নীতিন গডকরি, উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, শিবরাজ পাতিল, হরিয়ানার রাজ্যপাল জগন্নাথ পাহাড়িয়া, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল বি এল যোশী, মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি পি যোশী, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং প্রমুখ সকলে প্রয়াত ভৈরোঁ সিং এর প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

হত্যালীলা চালাতে নির্দেশ

(১ পাতার পর)

সেখানকার করাচির জঙ্গি শিবিরে যোগদান করে। পরে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি শিবিরও পরিচালনারও দায়িত্ব পায় সে। গোধরা পরবর্তী গুজরাতে আরও নাশকতার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু সম্ভবত মোদী সরকারের দৃঢ়তায় সেই পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় হক।

রবীন্দ্রনাথেরাও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন

(১ পাতার পর)

তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

এই প্রস্তাবে চাকরীর সততা ও ন্যায় ও সুবিচারের খাতিরে ভারত শাসন আইন অনুসারে আপনাকে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যথাশীঘ্র সম্ভব আপনার নিকট হিন্দু জনসাধারণের মতামত উপস্থিত করিব। ততদিন পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিবেন।"

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যার পি সি রায়, লর্ড সিংহ, শ্রীযুত রামানন্দ চ্যাটার্জি, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, স্যার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত জে এন বসু, মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীযুত এন কে বসু, শ্রীযুত জে চৌধুরী, শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, শ্রীযুত এস এন ব্যানার্জি, শ্রীযুত বি সি চ্যাটার্জ্জি, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুত জে এন গুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়, যোগেন্দ্রনাথ নস্কর, শ্রীযুত তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুত এইচ ডি বসু, শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী, শ্রীযুত এন সি চ্যাটার্জ্জি এবং আরও বহু ব্যক্তি উক্ত তারে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দক্ষিণবঙ্গে আয়োজিত প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ মে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার কাছে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ শাখার প্রাদেশিক প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের উদ্বোধন হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় শ্রীগুরুজী সভাগৃহে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে বর্গের উদ্বোধন করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের অধ্যাপক স্বামীগুণময়ানন্দ মহারাজ। উদ্বোধনের পর বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন দেশসেবক। এজন্য আন্তরিক সদিচ্ছা, নীতিনিপুণতা ও অনুভব প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ একথা বলে গিয়েছেন— জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর—এই কয়েকটি লাইনে। হিন্দুধর্মের এক ঐতিহাসিক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব হয়েছিল এই বাংলায়। শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে কথা তিনি বলেছেন তা করতে হবে। স্বামীজী মনশ্চক্ষে যে ভারতমাতার কল্পনা করেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। উদ্বোধনী ভাষণে প্রান্তসঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস বলেন, সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ কোনও সার্টিফিকেট পাবার জন্য নয়। স্বয়ংসেবকদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য, রাষ্ট্রকার্যের জন্য নিজেকে গড়ে তোলার স্থান সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ। এজন্য কষ্টের মধ্যেও আনন্দ আছে। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং পরম বৈভবশালী ভারত নির্মাণই আমাদের লক্ষ্য। বর্গে বর্গাধিকারী হিসেবে ছিলেন কলকাতা মহানগর কার্যবাহ সুশীল কুমার রায়। কার্যবাহ উজ্জ্বল বিশ্বাস। পালক হিসেবে পুরো সময় বর্গে রয়েছেন সঙ্ঘের প্রান্ত সেবা প্রমুখ দিলীপ কুমার আঢ্য। বর্গে ১৩০ স্থান থেকে ১৮৬ জন স্বয়ংসেবক যোগ দিয়েছেন।

বক্তব্য রাখছেন স্বামী গুণময়ানন্দ মহারাজ।

মুসলিম ভোটের টানেই মমতার পদবী ত্যাগ

(১ পাতার পর)

জন্যই উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের মানুষ ব্যবহার করেছে। তাই এসব ছাড়া উচিত। কিন্তু কার্যত তাঁদের একজনও পদবী এবং ধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন এমন কথা শোনা যায়নি। পার্টির উচ্চপদে অথবা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে অহিন্দু ব্যক্তিকে বসাতে দেখা যায়নি। সিপিএম পার্টিতে হাসিম আবদুল হালিম, মহম্মদ আমিন অথবা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম কিছুটা গুরুত্ব পেলেও তাঁরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষী মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। মনে রাখতে হবে যে রাজ্যের ২৬ শতাংশ মুসলিম ভোটদাতাদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ উর্দুভাষী। এঁরা সাধারণভাবে কলকাতাসহ শিল্পাঞ্চলের শহর এলাকার বাসিন্দা। নানা রকমের ব্যবসা বাণিজ্যই তাঁদের জীবিকা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী মুসলমানরা কৃষিজীবী। তাঁরা গ্রামে বাস করেন। মমতার টার্গেট এই দরিদ্র কৃষি নির্ভর বাঙালি মুসলিম ভোটদাতারা। গত ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং সাম্প্রতিককালে লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে বাঙালি মুসলিম ভোটাররা সিপিএমকে ছেড়ে বিরোধীদের পতাকার তলায় শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন। শুধুমাত্র মুসলিম ভোটদাতারাই নয়, এবার মমতার লক্ষ্য তপসিলি অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের জোরদার সমর্থন আদায় করা। এই জন্যই তিনি নিজেকে 'মতুয়া' ধর্মের অনুগামিনী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। এক কথায়, সিপিএমের কাছ থেকে সংখ্যালঘু, দলিত, তপশিলীদের সরিয়ে আনতেই মমতা ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় পুর নির্বাচনের মুখে পরিত্যাগ করেছেন। কথায় আছে, ভোটের গরজ বড় বালাই। তবে একটা কথা না বলে পারছি না। মমতা জাত ধর্ম সম্প্রদায় এ'সব কিছুই আর মানেন না। নিজেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ বলতেও তাঁর ঘোরতর আপত্তি। ভাল কথা তবে তাঁর এই 'অধর্ম' কথা কী মমতা মুসলিম ভোটদাতাদের বলবেন? তিনি কী তাঁদের মুসলিম ধর্মসূচক পদবী ত্যাগ করতে ডাক দেবেন? একবার সেই ডাক দিয়ে দেখুন না ফল কী হয়।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম নেতারা জনরোষের মুখে

নিজেরা নিরাপদে থেকে এগিয়ে দিচ্ছেন সাধারণ কর্মীদের

নিশাকর সোম

পৌর নির্বাচনের ধুমধাম প্রচার চলেছে বললে মস্ত ভুল হবে। একদিকে প্রবল গরম—অপরদিকে ব্যাপক লোডশেডিং এবং কর্মীদের কষ্টসহিষ্ণুতার ভাঁড়ারের শূন্যতা। সব মিলিয়ে প্রচারে নিস্তরঙ্গ অবস্থা। এর মাঝে নিজ নিজ দলকে চাঙ্গা করার জন্য নেত্রী-নেতা-সংবাদমাধ্যমগুলির ঢক্কা-নিনাদ।

তৃণমূল নেত্রী মমতা ঘোষণা করেছেন—পৌর-নির্বাচনে জয় হলেই তাঁরা অক্টোবরে বিধানসভা নির্বাচন চাইবেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে দিল্লীকে তিনি এ ব্যাপারে বাধ্য করবেন। প্রচারে তৃণমূল বলছে—বিগত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের দয়াতেই এ-রাজ্যের কংগ্রেস জিতেছে। এর সঙ্গে মমতা যোগ করেছেন—"আমরা কংগ্রেসের দয়াতে মন্ত্রিসভায় নেই, আমরা ইউপিএ-এর শরিক। আমরা আমাদের শক্তির জোরে মন্ত্রিসভায় আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত মর্যাদা পাব ততক্ষণ ইউপিএ-তে থাকবো। তা না হলে ইউপিএ ছেড়ে চলে যাব।" কার্যত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে মমতা হুমকি দিলেন। ১২৫ বছরের পুরাতন কংগ্রেস-এর আজ কি শোচনীয় অবস্থা!! আসলে এদেশে জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত সমস্ত শক্তির একমঞ্চে আসা প্রয়োজন—তাতে অবশ্যই বিজেপি থাকবে।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব আদর্শহীন হয়ে গদী রক্ষার জন্য সকল রকমের দুর্নীতি-সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সমঝোতা করে কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার টিকিয়ে রাখছে। তবে আগামী দিনে তাসের ঘরের মতো এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়বেই।

মমতা'র পৌর-নির্বাচনে এক নম্বর রাজনৈতিক স্লোগান হলো—দ্রুত বিধানসভা নির্বাচনে যাওয়ার জন্য পৌর-নির্বাচনে জয় চাই। এই বলে সিপিএম-বিরোধী শক্তিকে উস্কানি দিচ্ছেন। আর তৃণমূলী-কর্মীদের উদ্দীপিত করতে কংগ্রেস ভাঙার কৌশল নিচ্ছেন।

মমতা কলকাতায় বলেছেন—কলকাতাকে লণ্ডন করবেন, গঙ্গাকে টেমস নদী করবেন, জলকর বসাতে দেবেন না। জলকর সম্পর্কে বলা যায় এই কর বসানোর আবশ্যিকতা রয়েছে কারণ এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর এই শর্ত না মানলে তারা সাহায্য দেবে না। আমার ব্যক্তিগত একটা অভিমত হলো—লোকসভা নির্বাচনের পর সিপিএম মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে যদি বিধানসভা নির্বাচনে যেতো, তা'হলে এখন আবার বিধানসভা ভেঙে দিয়ে তৃণমূলকে ফের নির্বাচনে যেতে হোত! সেটা সিপিএম করতে চায়নি কারণ এ-বঙ্গের সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেসের আঁচলের ছায়াতে নিজেদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার এক লজ্জাকর অবস্থানে পৌঁছে গেছেন। তাই পলিটব্যুরোতে ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে বঙ্গ সন্তানরা এখনও নাকি বলেছেন যে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের 'ভুল' নীতির জন্যই এ-অবস্থা, প্রয়োজনে বঙ্গসন্তানরা নিজস্ব মতে-নীতিতে চলবে—তাতে পার্টিতে ভাঙন হলে হবে। এদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নেতৃত্বকে সরানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁরা শৃঙ্খলা তদারকি কমিটিতে মদন ঘোষকে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত মদন ঘোষকে রাজ্য কমিটির প্রজেক্টেড সম্পাদক করে তুলছিলেন প্রয়াত অনিল বিশ্বাস। বিমান বসুকে অনিল বিশ্বাস-জ্যোতি বসু একদম পছন্দ করতেন না। বিমান বসু যে ব্যর্থ তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে। এই হুমকির মোকাবিলা করার জন্য প্রকাশ কারাত পশ্চিমবঙ্গে পার্টির নেতাদের—তথা পার্টির ভেতরকার দুর্নীতি—ধনিক পোষণ, প্রমোটার স্তুতি, এন. জি. ও-এর নামে অর্থ সংগ্রহ এবং যৌন কেলেঙ্কারী প্রভৃতি ঘটনা উলঙ্গ করে দিয়ে বঙ্গজ সন্তানদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার-ই আজ প্রকাশ-পিল্লাই-এর ব্লু-আইড বয় অর্থাৎ নয়নের মণি।

> "সিপিএম পৌর কাজের সাফল্য বলতে পারছে না। এর উপর বিকাশ ভট্টাচার্য এবং বিশ্বজীবনের বক্তব্য সিপিএমকে দু-পা পিছনে ঠেলে দিয়েছে। এর মাঝে সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির সম্পাদক বিমান বসু নির্বাচনে রক্তগঙ্গা হবার কথা বলেছেন—পক্ষান্তরে মমতা বলেছেন নির্বাচনের দিন বোমা ফাটবে—তিনি বলেছেন কালীপুজোর মতো তা সহ্য করে নিতে হবে।"

এ-রাজ্যের পৌর-নির্বাচনে সিপিএম-এর কাজকর্ম রাইটার্স বিল্ডিং-এর কায়দায় চলছে—রাজ্য-কমিটি নির্দেশ দিচ্ছে, জেলা কমিটি নির্দেশ জারি করছে, জোনাল কমিটি লোকাল কমিটিকে হুইপ জারি করছে, লোকাল ব্রাঞ্চ কে 'শো-কজের' ভয় দেখিয়ে—আরও শাস্তির ভয় দেখিয়ে সাধারণ সদস্যদের জনসাধারণের মোকাবিলা করতে পাঠাচ্ছে—নেতারা কেউই মাঠে নেমে হাতে কলমে কাজ করছেন না, খালি বক্তৃতার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে পার্টিকর্মীদের সভায়। সিপিএম পৌর কাজের সাফল্য বলতে পারছে না। এর উপর বিকাশ ভট্টাচার্য এবং বিশ্বজীবনের বক্তব্য সিপিএমকে দু-পা পিছনে ঠেলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির সম্পাদক বিমান বসু নির্বাচনে রক্তগঙ্গা হবার কথা বলেছেন—পক্ষান্তরে মমতা বলেছেন নির্বাচনের দিন বোমা ফাটবে—তিনি বলেছেন কালীপুজোর মতো তা সহ্য করে নিতে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে সিপিএম এবং তৃণমূল দুই দলই হিংসাত্মক কাজের উস্কানি দিচ্ছে। এখন যাঁরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চান তাঁদের সরব হওয়ার সময় এসেছে। সমাজের কিছু মান্যগণ্য ব্যক্তিদেরও শান্তির বাতাবরণ-এর জন্য প্রয়াস দরকার। রাজ্যটাকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ফেলার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে।

এদিকে এ-রাজ্যের কংগ্রেস তাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার এক কঠোর-কঠিন লড়াইয়ে নেমেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য ৩০টা সিট পেলে তারা জোট রাখতো—জোট ভাঙার দায় মমতার একগুঁয়েমি। মমতা বলছেন 'কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতক'। এই লড়াইয়েও হানাহানি হতে পারে। এরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়েও নির্বাচন করতো তা'হলেও পরে পদ নিয়ে লাঠালাঠি হতো। ১২৫ বছরের কংগ্রেস আজ এ-রাজ্যে দলছুট দলের কৃপায় বাঁচার চেষ্টা করেছিল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কথাই ঠিক হলো—'স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া উচিত।' কংগ্রেসের এখন এ-রাজ্যের অস্তিত্বের লড়াই।

বামফ্রন্ট-এ এবার সিপিএম অনেকটা নমনীয় হয়েছে। এরই নাম গুঁতোর চোটে নরম হওয়া। এদিকে আর এস পি-এর নিচের তলায় বড় অংশ সিপিএমকে ক্ষীণতর করে দেবার জন্য দলীয় সমর্থকদের তৃণমূলের পক্ষে ভোট করতে বলেছে। পূর্ব-কলকাতায় সেটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এর সঙ্গে পূর্ব কলকাতার তৃণমূলের এক বিধায়ক বনাম এক পরাজিত বিধায়কের লড়াইয়ের চোরাস্রোত বইছে। কারণ, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন পাবার জন্য মাটি তৈরি করার লড়াই হচ্ছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের একাংশের মধ্যে নিজ দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা হচ্ছে। কলকাতার মেয়র পরিষদের বিদায়ী সদস্য ডাঃ সুবোধ দে-এর বিরুদ্ধে বামকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে। তাই এবারে ডাঃ দে-এর পক্ষে জেতাটা খুবই কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে। তবে শুধু ফরওয়ার্ড ব্লক নয় সমগ্র বামফ্রন্টের ভোট এবং আসন হ্রাস হবার সম্ভাবনা বেশি। দিশাহারা সিপিএম এবার মুখ্যমন্ত্রীকে পৌর নির্বাচনী প্রচারে নামাচ্ছে। এরপর যেখানে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন, সেখানে সেখানে ভোট কমলেই মুখ্যমন্ত্রীকে অপরাধী করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সমর্থকবৃন্দ ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিল বসুকে চড় থাপ্পড় মেরেছে এবং তাঁর পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দিয়েছে। এ-ব্যাপারে হুগলির এক প্রাক্তন সাংসদ পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিকট অভিযোগ-পত্র পাঠিয়েছেন।

তৃণমূলের অঘোষিত দৈনিকের এক সাংবাদিক বারাসতে পৌর নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই পত্রিকার দু'জন নাকি যথাক্রমে হাওড়া এবং বালিগঞ্জে প্রার্থী হবেন। এই পত্রিকা থেকে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠার সময়ে কার্যনির্বাহী সম্পাদক থাকা এক ব্যক্তি যিনি নিজেকে সিপিএম-এর নেতা হিসাবে জাহির করে থাকেন—তিনি পদত্যাগ করে চলে গেছেন। তিনি নাকি একটি দৈনিক প্রকাশ করতে চলেছেন? তবে তাঁর সম্বন্ধে ওই পত্রিকার সাধারণ কর্মীদের খুবই বিরূপ ধারণা আছে।

অন্য রকম

ইয়ামিনের মসজিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বস্তি পেতে পারেন গ্রীট-উইলডার্স। সেই গ্রীট উইলডার্স, যিনি নেদারল্যাণ্ডের পার্টি অব্ ফ্রিডমের চেয়ারম্যান। যিনি গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষান্তে আমেরিকায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন—'আমেরিকা আগামী দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যেই নিজ পরিচিতি হারাবে। তখন আমেরিকাতেই এই প্রশ্ন উঠবে কে ইউরোপকে গ্রাস করল? কিংবা ইউরোপের নিজ পরিচয় হারানোর কারণ কি?' প্রশ্নের জবাবটাও সেদিন দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে দেশীয় মুসলমানদের আর দেখা যায় না। গোঁড়া ধর্মান্ধদের কাছে বিকিয়ে যাচ্ছে মুসলিম মহল্লাগুলো। যার নিদারুণ ফলশ্রুতিতে অন্যান্য ধর্মস্থানগুলো উপেক্ষা করে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে মসজিদ।

গ্রীটের মনে হয়েছিল যে সেইসব মসজিদ থেকে একটা স্পষ্ট বার্তা পাঠানো হচ্ছে ইউরোপীয় সমাজে "দেখ আমরাই (অর্থাৎ বহিরাগত ধর্মান্ধ মুসলমানরা) ইউরোপ শাসন করছি।" গ্রীট উইলডার্স আরও একটা বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সেটা হলো, মুসলমান রমণীদের অসহায়তা। অল্পবয়স্ক অসংখ্য ছেলেমেয়ে আর কোলে বাচ্চা নিয়ে হিজাবে

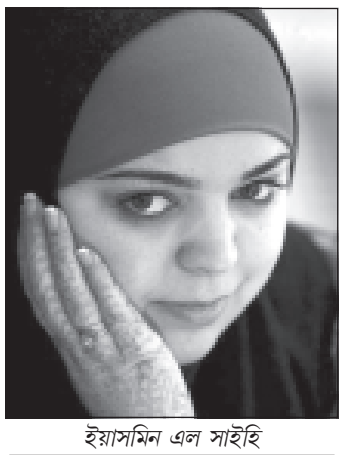

ইয়াসমিন এল সাইহি

মুখ লুকনো রমণীর ছবি ইউরোপের বুকে মোল্লাতন্ত্রের ছায়াকেই প্রতিফলিত করেছিল।

স্বাধীনতা হারানোর আশঙ্কায় কন্টকিত গ্রীট উইলডার্স সেদিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেও কোনও সমাধান বাতলাতে পারেননি। কিন্তু গ্রীট কি দেখেছেন ইয়াসমিন এল সাইহি-কে? যিনি নেদারল্যান্ডসে একটি বৃহৎ মসজিদের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। এই মসজিদ নেদারল্যাণ্ডে তো বটেই, সেইসঙ্গে ইউরোপেরও একমাত্র মসজিদ যেখানে পুরুষ ও নারী একসাথে কিন্তু পৃথকভাবে বসে প্রার্থনা করেন। সবচেয়ে মজার কথা, মসজিদে যে ধর্মোপদেশ দেওয়া হয় তার ভাষা আরবি নয়, ডাচ। বলাই বাহুল্য, নেদারল্যান্ডের এই মসজিদ কট্টর ইসলামীয় পন্থা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। যে কারণে ইসলামি দুনিয়ায় এক নারীর এহেন পদপ্রাপ্তির ঘটনা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। ভদ্রমহিলার বয়সও বেশ কম। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। উইল্ডার্স ইউরোপে বহিরাগত মুসলিম আগ্রাসনের কথা বলেছিলেন। বিশেষজ্ঞরাও সেই মতকে সমর্থন করে বলছেন, প্রচুর ইউরোপীয় মুসলিম পরম্পরাগত মসজিদ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। এবং প্রার্থনা ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পড়াশুনোর জন্যও তারা অন্যান্য গোঁড়া ইসলামিক গন্ডীর বাইরের স্থানকেই চয়ন করেন। ইয়াসমিন এল সাইহির মসজিদও তাই তাদের কাছে একঝলক টাটকা বাতাস, একথা বলাই বাহুল্য।

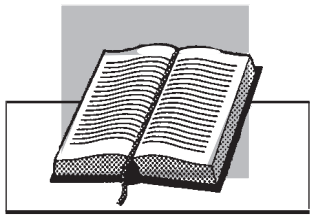

বীর সাভারকর, ডাঃ হেডগেওয়ার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

পুস্তক প্রসঙ্গ

সাধনানন্দ মিশ্র

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতের আকাশে তিন সূর্যের উদয় হয়েছিল। যাঁরা ভারতবর্ষকে বৃটিশের নাগপাশ থেকে উদ্ধার করে প্রখর জাতীয়তাবাদের আলোকে ভারতের হিন্দু জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আলোকিত ও পুনরুজ্জীবিত করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই বীর সাভারকর, ডাঃ হেডগেওয়ার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুরই নামোল্লেখ করতে হয়। সত্যি কথা, এই তিনজনই ভারতে ইংরাজ জাতির শাসনের ভিত্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলেন, যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বৃটিশ শাসককুলকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, অথচ ভারতের রাজনীতিতে এঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান সম্পর্কে কোন মূল্যায়ণই করা হয়নি। ‘সাম্প্রদায়িক’, ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’, ‘যুদ্ধবাজ’ আখ্যা দিয়ে এঁদের অবজ্ঞাই করা হয়েছে।

এই তিন মহাপুরুষকে স্মরণ করে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গের অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ, বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সহায়তায় একটি মূল্যবান্ গবেষণা গ্রন্থ (স্মারক পত্রিকা) প্রকাশ করেছেন। এই তিনজন মহাপুরুষের ভারতের জাতীয় জীবনে অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ ও যথাযথ বিস্তারিতভাবে তথ্যপ্রমাণসহ আলোকিত হয়েছে। এঁদের সম্পর্কে অনেক নূতন অজানা তথ্য অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে গবেষকগণ এঁদের সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এঁদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও ইচ্ছাকৃতভাবে কাল্পনিক ধারণা প্রচার করে তথাকথিত কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিথ্যা অপবাদ ও ‘সাম্প্রদায়িক’ আখ্যা দিয়ে এখনও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান গবেষকরা নানারূপে নানাভাবে গবেষণার মাধ্যমে তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেছেন, এই তিনজন ছিলেন বলিষ্ঠ ভারতীয় জাতীয়তার প্রধান স্তম্ভ ও রূপকার। বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও ইতিহাসবেত্তাগণ তাঁদের বিভিন্ন প্রবন্ধে এই তিনি মহাবীরের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস তথ্যপ্রমাণসহ পর্যালোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে বাংলায় ১৩টি ও ইংরাজীতে ১৫টি মূল্যবান প্রবন্ধ ও বহু অপ্রকাশিত ছবি সংকলিত করা হয়েছে।

তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ। ১৮৫৭ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (ইংরেজের মতে সিপাহী বিদ্রোহ) শেষ হয়েছে। ইংরেজ শাসকরা কঠোর হস্তে দমন করেছে এই সংগ্রাম। ভারতের হিন্দুরা মুসলমান শাসকদল ও পরে ইংরেজের হাতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত হতে হতে হীনবল ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ধর্মের নামে নানারূপ কুসংস্কারেরও জন্ম হয়েছিল। জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি সামাজিক পাপ সমগ্র জাতিকে গ্রাস করেছিল। তখন জাতির জীবনে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মোদ্দীপক ভাষণে হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় উদ্দীপনা, দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি ও লোকমান্য তিলক শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসবের মাধ্যমে সাহস ও দেশভক্তির সঞ্চার করেছিলেন। সেই পথের ধারা অনুসরণ করে ভারতে হিন্দুদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল বিপ্লবের বাণী—‘ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই’। বিপ্লবী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ও বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে মহারাষ্ট্রে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, সেই বিপ্লবের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস ক’রে হিন্দুদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী শত শত অগ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত ক’রে সারা ভারতে ও বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মহাবিপ্লবী বীর সাভারকার। তিনিই প্রথম বিপ্লবী যিনি লণ্ডনে ১৯০৬ সালে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে লণ্ডনে থেকেই ‘অভিনব ভারত’ সোসাইটির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আলোচ্য স্মারক পত্রিকাটিতে এই তিন মহাপুরুষের সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

হিন্দুরাষ্ট্রের পুনর্জাগরণের প্রেরণাদাতা বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর ইংরেজ সরকারের দ্বারা মিথ্যা বিচারে দু’দুটি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকার সময় বৃটিশ সরকারের দ্বারা শত অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষ ও হিন্দুজাতিকে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তার ভিত্তিতে বিশ্বের এক অজেয় শক্তিরূপে গঠন করবার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দেশপ্রেমিক, প্রখর বাগ্মী ও মহানবিপ্লবী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ‘হিন্দুত্ব’, ‘১৮৫৭ ভারতের প্রথম স্বাধীনতাসংগ্রাম’, ‘হিন্দু পদ-পাদশাহী’, ‘ভারতের ইতিহাসের ৬টি গৌরবময় অধ্যায়’ প্রভৃতি পুস্তক রচনা ও কবিতা প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দুর সংজ্ঞা অত্যন্ত সহজেই তিনি নির্দ্ধারণ করেছিলেন—‘আসিন্ধু-সিন্ধু পর্যন্তা যস্য ভারত ভূমিকা। পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।।’—এই একটি শ্লোকের দ্বারা। অর্থাৎ সিন্ধু নদ থেকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমিকে যারা পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে মনে করে তারাই হিন্দু। শক্তিশালী হিন্দুজাতি গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু যুবকদের ডাক দিয়েছিলেন—

‘ঙ্ক্রন্তস্তুত্তনন্দ্দ্ধ তুঙ্গপ্তুনন্দ্ধনস্তুন্দ্ধ ক্রস্তু ত্তনপ্তুনন্দ্ধজনন্দ্দ্ধ ঙ্ক্রন্তস্তুত্তস্তুস্পপ্প’—যার ফলে অসংখ্য হিন্দু যুবক ইংরেজ আমলে যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এই হিন্দু যুবকরাই নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কংগ্রেসের মুসলিম তোষণনীতির বিরুদ্ধে ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের মরীচিকার পিছনে না ছুটে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে কোনও আবেদন নিবেদন, কোনও আলাপ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে প্রয়োজন হলে সহিংস পথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে ভারতে বৃটিশদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ভারতে হিন্দুপ্রধান গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর প্রধান নীতি। হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতামত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আদর্শ হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাঁর মতামত, পরিকল্পনা ও যে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন, তা এখনও পর্যন্ত হিন্দুজাতির জাতীয় প্রেরণার মূল উৎস। তাঁর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—অথচ মুসলিম-তোষণকারী তথাকথিত মেকী জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে এবং হিন্দুসংগঠনগুলিকে ‘সাম্প্রদায়িক’ আখ্যা দিয়ে চলেছে এখনও। বলা বাহুল্য, এরা কিন্তু বেশীর ভাগই হিন্দু।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন) প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার ছিলেন জন্মগত দেশভক্ত। বীর সাভারকর ও ডাঃ হেডগেওয়ারের তুলনা করতে গিয়ে দুজনের মধ্যে বেশ কিছু মিল দেখা যায়। দুজনেই জন্ম থেকেই দেশপ্রেমী, বিদেশী শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার বিষয়ে দুজনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত থাকার জন্য দুজনেই কর্মস্থল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। দুজনেই লোকমান্য তিলকের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। দু’জনেই ছিলেন সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাসী, বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত। দুজনেই হিন্দু সংগঠনের ডাক দিয়েছিলেন। সাভারকর ছিলেন হিন্দু আদর্শবাদী, প্রেরণাদাতা ও চালিকাশক্তি, হেডগেওয়ার নীরবে ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দুজাতিকে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে দেশজুড়ে সঙ্ঘশাখার জাল বিস্তার করেছেন—যা আজ বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করেছে, যা দেখে শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বৃথা নিন্দা ও কুৎসা রটনায় ব্যস্ত। একজন ব্যারিস্টার, অন্যজন ডাক্তার—ইচ্ছা করলে এঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সুখে থাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের সমর্পণ করে দিয়েছেন। দুজনের পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য একই—হিন্দুরাষ্ট্রের পুনর্জাগরণ, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর মান, মর্যাদা, ধর্ম, সংস্কৃতি সব বজায় রেখে জগতে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী, শৃঙ্খলাবদ্ধ, অজেয় হিন্দু জাতি হিসাবে প্রদীপ্ত হয়ে থাকবে। জগতের কোনও শক্তি যেন ভারতবর্ষের মর্যাদাহানি করতে সাহস না পায়। সাভারকারের জীবন থেকে হিন্দুত্বের প্রেরণা নিয়ে এখনও শাখা-পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কাজ করে চলেছে।

নেতাজীর সুভাষচন্দ্র বসু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি আই. সি. এস পাশ করেও সরকারি চাকুরী গ্রহণ করেননি, ভারতমাতার সেবায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসে সভাপতি থাকাকালীন গান্ধীজীর অহিংস পথে বৃটিশ শক্তির সঙ্গে আলোচনা বা চুক্তির মাধ্যমে বা আবেদন-নিবেদনের পথে গিয়ে বৃটিশকে দেশ থেকে তাড়ানো যাবে—এ কথা কখনই বিশ্বাস করেননি। তিনি কংগ্রেস থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। নূতন রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেও তিনি তাঁর ঈপ্সিত পথে চলতে পারেননি। তাঁর ঈপ্সিত পথ ছিল—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশ শক্তিকে উৎখাত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বীর সাভারকরের সঙ্গে তাঁর মুম্বই এর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বীর সাভারকরজী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে, এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময় ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার। শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র। বৃটিশের শত্রুপক্ষ জার্মানী, জাপান ও রাশিয়ার সাহায্যে বৃটিশকে আঘাত করার জন্য ভারত থেকে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে আপনি সৈন্যবাহিনী গঠন করুন। আমার ঘোষণা অনুসারে হিন্দু যুবকগণ দলে দলে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আপনি স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনী গঠনের ডাক দিলে সেই সব দেশভক্ত যুবকেরা আপনার বাহিনীতেই যোগ দেবে। জাপানে রাসবিহারী বসু এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনিই একমাত্র এই কাজ করতে পারবেন’। সুভাষচন্দ্র বসু সাভারকারজীর কাছ থেকে এই প্রেরণা নিয়ে গেলেন। তারপর ১৯৪১ সালে তাঁর মহানিষ্ক্রমণ। তারপরের ঘটনাবলী এখন ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ভারতে থাকাকালে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এই কর্মধারায় প্রশিক্ষিত দেশভক্ত স্বয়ংসেবকবৃন্দ যে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এগিয়ে আসবে, এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস দলের নেতারা বীর সাভারকরের বিপ্লববাদ, হিন্দুত্ব ও ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে হিন্দু যুবকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার-আহ্বান, হিন্দু-মুসলমান মিলনের মরীচিকা সম্পর্কে সাভারকারজীর মতামত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের হিন্দু সংগঠন ও ভারতভক্তি এবং সর্বোপরি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সংগঠিত করে জাপানের সাহায্যে সম্মুখ যুদ্ধে বৃটিশকে পরাজিত করে ভারত দখল করার পরিকল্পনাকে সহ্য করতে পারেননি। কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টরা চিরকাল এই তিন মহাবীরের মিলিত শক্তি ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথের বিরোধিতা করে এসেছে। দেশ-ভাগের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান মিলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই তিন মহাবীর ভারতভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ভারতমাতা ত্রিধাবিভক্ত হয়েছেন। আবেদন - নিবেদন, গোপন চুক্তি ও ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের ফলে ভারত-বিভাজক কংগ্রেস হিন্দু-বিরোধী নেহরুর নেতৃত্বে হিন্দু-ভারতের শাসন ক্ষমতায় বসেছে। দেশভক্ত এই ‘ত্রয়ী’র মধ্যে (বীর সাভারকর, ডাঃ হেডগেওয়ার, নেতাজী সুভাষ)—প্রথমজন ছিলেন হিন্দুত্বের প্রেরণা ও শক্তি, দ্বিতীয়জন ছিলেন সেই প্রেরণা ও শক্তিকে চিরজাগ্রত রেখে, সংহত ও সক্রিয় করে বিশাল ভারতের জাতীয় ক্ষেত্রে দক্ষ হিন্দু সংগঠক, তৃতীয়জন ছিলেন সেই প্রেরণা ও শক্তিকে সক্রিয়ভাবে সংগঠিত করে দেশরক্ষার জন্য দেশভক্ত, সুশিক্ষিত, যুদ্ধ নিপুণ সৈন্যবাহিনীর সংগঠক। একে অন্যের পরিপূরকরূপে কাজ করে গেছেন। এখনও সেই কর্মপ্রবাহ চলছে। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা কোনদিন বিফলে যাবে না, যেতে পারে না। রাত্রির তপস্যা একদিন না একদিন সুপ্রভাত নিয়ে আসবেই।

এই গবেষণালব্ধ স্মারক পত্রিকাটি প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ জাতির ধন্যবাদার্হ ও প্রশংসাভাজন হয়েছেন। যাঁরা এই তিন মহাপুরুষ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, বরং সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন, সেই বর্তমান প্রজন্মের রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন যুবকদের বারংবার এই পুস্তকটি পাঠ, ভাবনাচিন্তা ও চর্চা করলে ভারতমাতার প্রতি ভক্তি, ত্যাগ ও সর্বস্ব সমর্থনের ভাবরসে জারিত হয়ে থাকেন—এই আশা করি। পুস্তকটির বহুল প্রচার একান্তই কাম্য।

‘বীর সাভারকর, ডাঃ হেডগেওয়ার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র’—স্মরণে ও প্রকাশনায়—জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ, ২৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬—সহায়তায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা ও শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়—কলকাতা-৭০০০০৭। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৬, মূল্য ৫০্ মাত্র।

নবজাগ্রত ভারতের রাষ্ট্রপুরুষ
রাসবিহারী বসু

অমিতাভ ঘোষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। অনেক উত্থান-পতনের পর মিত্রশক্তি জয়লাভ করেছে—১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের ফলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে পরাজয় স্বীকার করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বিজয়ী মিত্রশক্তি রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে বৃটেন ছিল অন্যতম, যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলির তত্ত্বাবধানে পরাধীন ভারতের বন্ধনমোচন ঘটল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে, ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কয়েকবছর পর বৃটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি এলেন কলকাতায় কোনও উপলক্ষে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ মুখার্জির সঙ্গে অ্যাটলি সাহেবের সাক্ষাৎকারের সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও বৃটেন কেন এত তাড়াতাড়ি দু'বছরের মধ্যেই ভারত ছেড়ে চলে গেল—গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলেই কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? অ্যাটলি জবাব দিয়েছিলেন—গান্ধীজীর আন্দোলন নয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কীর্তিকলাপের প্রভাবে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ধূমায়িত অসন্তোষের ফলেই এই সিদ্ধান্ত। তমোগুণে আচ্ছন্ন নিদ্রিত ভারতীয় জাতিকে পুনরায় জাগ্রত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বজ্র নির্ঘোষে 'অভীঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বারংবার। সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে লড়াই করে তা অর্জন করতে হবে। ভারতের জনগণের মধ্যে রজোগুণ সঞ্চারিত করার জন্য, তাদের মানসিকতায় লড়াকু প্রবণতার উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী প্রচলিত খাদ্য-ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালে স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে গেলেন—ভারত ছেড়ে সুদূর আমেরিকা মহাদেশে পাড়ি দিলেন। ওই বছরেই শ্রীঅরবিন্দ ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করে ভারতে পদার্পণ করলেন। ১৯০৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ গুজরাট থেকে কলকাতায় এলেন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে। তার কয়েকবছর আগে থেকেই শ্রী অরবিন্দের লেখনী নিঃসৃত প্রবন্ধাবলী নবপ্রজন্মের তরুণ সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীব্যাপী শক্তিপ্রবাহের তরঙ্গ ভঙ্গের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভবানীমন্দির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশ-মাতৃকার বন্ধন-মোচনের জন্য তরুণ দেশপ্রেমিকদের শক্তির আরাধনা ও সাধনায় উদ্বুদ্ধ করছিলেন। বিদেশী রাজশক্তির কাছে আবেদন-নিবেদন নয়—সংগঠিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী শাসককুলকে পর্যুদস্ত করে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে।

ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার বহু বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দের লেখা রাজনীতি-সংক্রান্ত রচনাবলীর মধ্যে 'প্রোলেটারিয়েট' শব্দ উল্লিখিত হয়েছিল। অর্থাৎ দেশের আপামর জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের তৃণমূলস্তরে অবস্থানকারী মুচি, মেথর ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করার জন্য তরুণ সম্প্রদায়কে উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন জাতীয় মানস দেশাত্মবোধক মৌলিক চিন্তাধারার দ্বারা আলোড়িত হচ্ছিল, সে সময়ে যেসব তরুণ দেশভক্ত সংগঠিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী বসু ছিলেন অন্যতম।

১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল বৃটিশ রাজশক্তির নিপীড়ন নীতি, তার প্রতিবাদে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে খতম করার জন্য মুজফফরপুরে বোমা নিক্ষেপ করল ১৯০৮ সালে। ১৯১২ সালে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লীতে নবনির্মিত রাজধানীতে প্রবেশ করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। সে সময় তাঁর উপর বোমা নিক্ষেপ করলেন তরুণ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ভাইসরয় রক্ষা পেলেন। রাসবিহারী বসুর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁকে পাকড়াও করার জন্য বিদেশী প্রশাসন উঠে পড়ে লাগল। ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত প্রসারিত কালখণ্ডে রাসবিহারী কিভাবে কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন —সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। সরকারী গুপ্তচর একবার রাসবিহারীর আস্তানার খোঁজ পেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানাতেই বিশাল পুলিশবাহিনী জায়গাটা ঘিরে ফেলল। কিন্তু রাসবিহারী বসু ধরা পড়লেন না। তিনি মেথরের বেশে মলপূর্ণ ভাণ্ড মাথায় নিয়ে পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মেথর যে স্বয়ং রাসবিহারী বসু, প্রহরারত পুলিশের মনে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের ছায়াপাত হলো না।

১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসু রাজা পি. এন. ঠেগোরের ছদ্মবেশে জাহাজে চেপে জাপানে পালিয়ে গেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক বছর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। টোকিওতে পৌঁছেই রাসবিহারী বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বসু চলে গেলেন চীনদেশের সাংহাই শহরে। সেখানে জার্মানদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে তাদের রাজী করালেন ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে চীনাদের মধ্যস্থতায়। জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'এমাগুন' বঙ্গোপসাগরে আবির্ভূত হয়ে ত্রাসের সঞ্চার করল। যুদ্ধ-জাহাজ থেকে মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) শহরে কামানের গোলা আছড়ে পড়ল। সাংহাই শহরে বসে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত না হলেও বসু বিপুল উৎসাহে তাঁর কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেলেন। জাপানে থাকাকালীন রাসবিহারী বসুকে সেদেশের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী ও সমরকুশল নেতা মিৎসুই তোয়ামার আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়েছিল প্রায় আট বছর— ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। বসুকে জাপান থেকে বন্দি করে ভারতে ফিরিয়ে আনবার জন্য জাপান-স্থিত বৃটিশ এমব্যাসি তৎপর হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্কটের সময় তোয়ামা রাসবিহারীকে রক্ষা করেছিলেন।

ভারতে রাসবিহারী বসুর বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে লালা লাজপত রায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। রাসবিহারী বসু জাপানে পাড়ি দেওয়ার সময় তাঁর পেছন পেছন লালা লাজপত রায়ের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সাভারওয়ালও জাপানে চলে আসেন। লালাজী যখন আমেরিকায় গেলেন সে সময় রাসবিহারী তাঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন।

মহাচীনের নবজাগরণের ডঃ সানইয়াৎ সেন জাপানে এলেন, মিৎসুই তোয়ামার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সে সময় ডঃ সানইয়াৎ সেন-এর সঙ্গে রাসবিহারী বসুর দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ-আলোচনা হয়েছে—দক্ষিণপূর্ব এশিয়াস্থিত দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের বিষয়ে। তোয়ামা, সানইয়াত সেন ও রাসবিহারী বসু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এশিয়া খণ্ডের মুক্তির জন্য চীন, জাপান ও ভারতকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

১৯২৩ সালে রাসবিহারী বসু জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। আত্মগোপনের প্রয়োজন আর রইল না। তিনি জাপানী মহিলার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন। জাপানী ভাষা আয়ত্ত করলেন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত প্রসারিত কালখণ্ডে অজস্র পুস্তক প্রণয়ন করেছেন জাপানী ভাষায়, যেসব বই-এর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী ছাড়াও রয়েছে গীতা, রামায়ণ, রবিঠাকুরের 'শেষের কবিতা'র অনুবাদ ও ভারতীয় হাস্যরস সংক্রান্ত পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে প্রথম গিয়েছিলেন সে সময় তিনি রাসবিহারী বসু ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু প্যান্ এশিয়ান লীগ স্থাপন করলেন ১৯২৬ সালে। সেই উপলক্ষে তিনি চলে গেলেন কোরিয়াতে। ১৯৪১ সালে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর বসুর কর্মতৎপরতা অনেকগুণ বেড়ে গেল। তিনি ১৯৪২ সালে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ স্থাপন করলেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করার জন্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্বত্র ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের শাখা স্থাপন করলেন। ১৯৪২-এর মার্চ মাসে লীগের বিভিন্ন শাখার সম্মেলন ডাকা হলো টোকিও শহরে। সেখানে আই. এন. এ—ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির গোড়াপত্তন হলো। ১৯৪২-এর জুন মাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আহূত হলো—থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক শহরে। সেই সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে ভারতবর্ষের অবিভাজ্যতা বা অখণ্ডতার উপর জোর দেওয়া হয়।

ঘটনার স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছিল। নেতাজী সাবমেরিনে চেপে জার্মানী থেকে জাপানের টোকিও শহরে এসে পৌঁছলেন ১৯৪৩ সালের জুন মাসে। ৪ঠা জুলাই তারিখে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু একটি ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যুগপৎ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সভাপতি ও আই. এন. এ.-র সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। রাসবিহারী প্রধান উপদেষ্টার ভূমিকায় রইলেন। স্বহস্তে স্থাপিত ও সযত্নলালিত লীগ ও আই. এন. এ-র কর্তৃত্ব যেভাবে বিনা দ্বিধায় রাসবিহারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন—এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েও জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রিত্বের গদি আঁকড়ে রেখেছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর শারীরিক অসুস্থতার আভাস পাওয়া মাত্রই তাঁর সহযোগী এন্টনি ইডেনকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নবজাগরণ কল্পে রাসবিহারী বসু যে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, তা তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়েকবছর পরেই তাঁর উত্তরসূরী নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আই. এন. এ বা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কার্যকলাপের ফলে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হলো।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিও স্বীকার করেছেন যে গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলনের ফলে বৃটিশ রাজশক্তি বিচলিত হয়নি। রাসবিহারীর ও সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি বৃটেনের ভারত-ত্যাগ।

উনবিংশ শতকের আশির দশকে মহানায়ক রাসবিহারী বসুর আবির্ভাব ঘটেছিল ২৫ মে তারিখে আর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারী তারিখে। রাসবিহারীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে জাপানের সম্রাট তাঁকে সেই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন। নবজাগ্রত ভারতের উজ্জ্বলতম প্রতীক বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু নিঃসন্দেহে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রপুরুষ রূপে বন্দিত হবেন।

।। রাসবিহারী বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত।।

পড়ুন শ্রী হৃদয় রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রণীত

১। জন্মান্তরবাদ (পুনর্জন্ম সম্পর্কীয় গ্রন্থ)	১৫.০০	৬। সমস্যার আবর্তে হিন্দুজাতি ও ভারতবর্ষ	৬.০০
২। ভারত কি খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার পথে?	১০.০০	৭। ধর্মান্তরীকরণ রোধে ভারতের হিন্দুরা	৫.০০
৩। (রিপু) হিন্দু : (ক্ষয়িষ্ণু) ভারত		৮। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য (মাহাত্ম্য সহ)	৫.০০
৪। গর্ভবাসী শিশুহত্যা কী স্বাস্থ্য ও ধর্মসম্মত?	৮.০০	৯। নরকবাস কেন? কোন পাপে? (সুলভ সংস্করণ)	৫.০০
৫। জাতিস্মরের কাহিনি	৭.০০	১০। ভারতে বাঙালি, অতীতে ও বর্তমানে	৬.০০
(পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনা সহ)		১১। Hindu Majority & India's Integrity	৩.০০

বিঃ দ্রঃ-১ : গ্রন্থ নং ১-ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'যে উপায়ে হোক, আর যে দিক দিয়েই হোক, এই ভারত বিভাগ রদ করতেই হবে।' তাঁহার উক্তিকে মর্যাদা দেওয়ার একমাত্র উপায় - জন্মান্তরবাদভিত্তিক হিন্দুধর্মের অনুকূলে প্রচার চালিয়ে পূর্ববঙ্গ সহ হিমালয়ের এধারের সমস্ত এলাকাকে ধর্মের ভিত্তিতে এক করা, যাহা পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য পূরণের প্রথম পদক্ষেপ।
বিঃ দ্রঃ-২ : গ্রন্থ নং ২, ৩, ৬, ৭ ও ১১ – (ক্ষয়িষ্ণু ভারতের জন্য চিন্তান্বিতদের অবশ্য পঠনীয় এবং গ্রন্থ নং-৪ ভ্রূণহত্যার মারাত্মক কুফল, এইডসের মূল কারণ ইত্যাদির বর্ণনা। পুস্তিকা নং ১০-মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে রচনামূল্য।

প্রাপ্তিস্থান :
বড়ুয়া চৌধুরী অ্যান্ড কোং — ২৬, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
সেন্ট্রাল লাইব্রেরি — ১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্কোয়ার) কলকাতা-৭৩
আশা নিকেতন ৩০/ই, দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ ও গ্রাম—ভদ্রকালী, জেলা হুগলি, পিন-৭১২২৩২
(হিন্দমোটর রেলওয়ে স্টেশন থেকে পূর্বদিকে প্রায় ১০ মিনিট হাঁটা পথে)

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধারণ সম্পাদক পূজ্য স্বামী বুদ্ধানন্দজীর করকমলে ২রা মে প্রকাশিত হল শ্রী দেবজ্যোতি রায়-এর লেখা

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ
- একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ

বিপুল চাহিদায় শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রকাশিত হবে
শ্রী নিত্যরঞ্জন দাস-এর
"মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ"
তৃতীয় সংস্করণ।

তুহিনা প্রকাশনী ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
ফোনঃ ২৩৬০ ৪৩০৬, মোবাইলঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

অনুপ্রবেশের শাস্তি

বিশ্বের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে অনুপ্রবেশ এক অন্যতম সমস্যা। বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন কড়া ব্যবস্থা। উত্তর কোরিয়ায় অনুপ্রবেশের শাস্তি হলো কমপক্ষে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ইরানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী রাখা হয় অনুপ্রবেশের অপরাধে। আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের শাস্তি দেখামাত্র গুলি চালিয়ে হত্যা। সৌদি আরবেও রয়েছে কারাবাসের সাজা। চীনে একজন অনুপ্রবেশকারী কমিউনিজমের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে যায় তার ঠিকানা কেউই বলতে পারেন না। অপর কমিউনিস্ট দেশ ভেনিজুয়েলাতে একজন অনুপ্রবেশকারীকে বিদেশী গুপ্তচর হিসাবে দেখা হয় এবং তার ভাগ্যাকাশের অন্ধকার কখনই দূর হয় না। ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবা এবং ধনতন্ত্রী বৃটেনেও অনুপ্রবেশের শাস্তি কারাবাস।

কিন্তু সেকুলার ভারতবর্ষে এই প্রকার অপরাধের কোনও দণ্ডই নেই। বদলে একজন অনুপ্রবেশকারী এখানে রেশন-কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েই থাকে। এছাড়াও হজযাত্রায় ভর্তুকি, সরকারি চাকরীতে সংরক্ষণ, কম সুদে গৃহঋন, শিক্ষাঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকে অনুপ্রবেশকারীদের। বিনামূল্যে মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয় এখানে সরকারি অনুদানে। এজন্যই অনুপ্রবেশ ভারতের ভবিতব্য।

—রাজু হালদার, হালাড়া, জামালপুর, বর্ধমান।

মুসলিম সংরক্ষণ

কয়েক বছর আগে সাচার কমিটির রিপোর্টে প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলিম সমাজে দেখা দিয়েছিল বিরাট প্রতিক্রিয়া। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন সারাদেশে মুসলিমদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি তদন্ত করে সম্প্রতি সরকারের কাছে পেশ করা রিপোর্টে চাকরিতে মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করেছে। ব্যস্, সাচার কমিটির ধাক্কায় কুপোকাৎ রাজ্য সরকার মিশ্র কমিশনকে হাতিয়ার করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই সরকারের পাশ থেকে সরে যাওয়া মুসলিম ভোট পুনরায় ফিরে পেতে, অর্থাৎ মুসলিমদের মন ভেজাতে 'সামাজিকভাবে অনগ্রসর' শ্রেণীর মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। কারণ ক্ষমতা যে বড় বালাই!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিমদের মধ্যে 'সামাজিকভাবে অনগ্রসর' শ্রেণী বলতে কিছু আছে কী? ইসলামের দৃষ্টিতে বা ইসলামিক ধর্মগ্রন্থে মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ, বৈষম্য, অগ্রসর-অনগ্রসর বা জাতিভেদ নেই। কাজেই 'সামাজিকভাবে অনগ্রসর মুসলিম' 'সোনার পাথরবাটি' ছাড়া আর কী? মুসলিম সমাজ কিন্তু সরকারের এহেন পদক্ষেপে সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় না সরকার মুসলিমদের সামাজিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করুক—যা ইসলাম বিরোধী। বরং তারা চান সমগ্র মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ। মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ চান এই সংরক্ষণ হোক ২০ শতাংশ, কেউ চান ২৫ শতাংশ, আবার কেউ চান মুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে, অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার যত শতাংশ মুসলিম তত শতাংশ সংরক্ষণ।

কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মভিত্তিক' সংরক্ষণের কোনও সংস্থান নেই। যা আছে তা হলো—জাতি ও শ্রেণী ভিত্তিক সংরক্ষণ তপশিলীজাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী)। কাজেই 'ধর্মভিত্তিক' সংরক্ষণ অসাংবিধানিক। সেই কারণে 'মুসলিম সংরক্ষণ' হওয়া অসম্ভব। একে সম্ভব করার জন্য রয়েছে একটি মাত্র উপায় ঃ সংবিধান সংশোধন। কিন্তু ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাই এই মৌলিক নীতিটির পরিবর্তনও অসম্ভব। সংবিধান বিরোধী কোনও সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আদালতে কেউ জনস্বার্থ মামলা ঠুকলে আদালতে সেই সংরক্ষণ বাতিল হতে বাধ্য। অঙ্ক সরকার কর্তৃক ঘোষিত এরূপ একটি সংরক্ষণকে সম্প্রতি অন্ধ্র হাইকোর্ট অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দিয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, একশ্রেণীর মুসলিম নেতা এহেন ঘটনার কথা জানার পরেও মুসলিম সংরক্ষণের দাবি তুলছেন কোন্ যুক্তিতে? তবে কী তাঁরা চাইছেন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পরিবর্তন ও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তন? কিন্তু কেন?

ইতিহাস সাক্ষী দেয় মুসলিম লিগ গঠিত হওয়ার পর জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি তুলেছিলেন। এমনকী, পাকিস্তান হাসিলের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়েছিলেন ডাইরেক্ট অ্যাকশনের। ফলে '৪৬-এর কলকাতা ও নোয়াখালির মহাদাঙ্গায় অসংখ্য মানুষের ঘটেছিল প্রাণহানি। গান্ধীজী-নেহরুজী তথা কংগ্রেস দেশভাগ ঠেকাতে পারেননি। '৪৭ সালে সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামিক পাকিস্তান। কিন্তু সেদিনের দাঙ্গা ও দেশভাগের স্মৃতি আজও কোটি কোটি ভারতবাসী ভুলতে পারেননি। তাই তাঁদের প্রশ্ন ঃ আজকের মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের দাবি অবশেষে দেশ ভাগের আর একটা দাবিকে ডেকে আনবে না তো? আসলে ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাবেই। অতএব সাধু সাবধান!

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চীনের ভারত-বিরোধিতা

উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়ার সহযোগিতায় মায়ানমার গোপনে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটর এবং প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতির কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তারা ২০১৪ সনের মধ্যেই পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত। বিতর্ক এ নিয়েই।

আমার মনে হয় এসব নিয়ে ভারতবাসীর বিচলিত হবার কোনও কারণ নেই। ভারতবর্ষ একটি পরমাণু শক্তিধর উন্নত দেশ। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক স্বার্থে তাকে যেমন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়, রাশিয়াকেও তেমনি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। তবে মায়ানমারের মতো একটি অনগ্রসর দেশ এ ধরনের কর্মসূচী কেন গ্রহণ করল তা নিয়েই এখন বিভিন্ন মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কমিউনিস্ট নাগপাশ ছিন্ন করে সোভিয়েত রাশিয়া এখন অবস্থান করছে গণতান্ত্রিক রাশিয়ায়। তবে তাকেও এখন আংশিক গণতন্ত্র বলা যায়। এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যেও অনেক পিছিয়ে পড়েছে রাশিয়া। তাই হয়তো হাতের কাছে যা পেয়েছে তা নিয়েই আর্থিক দুরবস্থা কাটাতে চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ভারত কখনও পরমাণু শক্তি নিয়ে ফাটকা ব্যবসা করতে আগ্রহী নয়। তাই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের শত্রুতা বা এ ধরনের কোনও প্রতিযোগিতারও সম্ভাবনা নেই। এখন চীনের সঙ্গেই ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক অনেক বেশি। তারপরেও ভারতের ভূখণ্ড এবং বাজার দখল করতে সম্প্রতি চীনের যে গোপন কর্মসূচী প্রকাশ পেয়েছে, তাতে চীনকেই বলা যায় ভারতের প্রধান শত্রু। তারা দীর্ঘদিন ধরে যে নেপাল এবং ভারতবর্ষে মাওবাদী সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে তাদের সদ্য প্রকাশিত কর্মসূচীতে তাও প্রকাশ পেয়েছে। রাশিয়া ভারতে কমিউনিস্ট বীজ বপন করলেও তারা কিন্তু এ ধরনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে কখনও মদত দেয়নি। চীনা মদত পুষ্ট সন্ত্রাসীরাই ভারতে যত অশান্তির কারণ।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

স্বস্তিকা ও ছাত্রছাত্রীরা

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বর্তমান সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালক এমনকী অভিভাবকরাও শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে বহু দূরে সরে যাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চরিত্রগত আদর্শহীনতার কারণে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনে অনুসরণযোগ্য বলে মনে করতে পারছে না। উপ্টোদিকে যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নৈতিক বিষয়ের চর্চা ও অনুশীলন করেন তাঁরা সমাজে ব্রাত্য! প্রধান শিক্ষক মহাশয় তথা পরিচালন সমিতির সদস্যরা তাঁদের সঠিক কাজকর্মের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। গণমাধ্যম বিশেষত টেলিভিশন ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে প্রণোদিত করছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজতে 'স্বস্তিকা'র মতো জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ পত্রিকাগুলির গুরুত্ব অসীম। তাই স্বস্তিকাতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ লেখা আরও বেশি করে দাবি করি।

—সুকান্ত আওন, জামালপুর, বর্ধমান।

শিল্পমন্ত্রীর বাগাড়ম্বর

কিছুদিন পূর্বে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আনিসুর রহমান বলেছিলেন সিঙ্গুরে মমতার অনশনে মমতা নাকি সরবত পান করে অনশন করতেন, তিনি নাকি খোঁজ নিয়ে তা দেখেছেন। আর তার তৃণমূলকে বলেছেন, খচ্চরের পার্টি। আর গুঁড়ির সাক্ষী মাতালের মতো শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেছেন, বর্ধমানের সাফাইকর্মীরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় কোথায় খায় তা রোজই দেখেন তিনি। একজন শিল্পমন্ত্রীর তাহলে কাজ সাফাই কর্মীদের রোজ গুঁড়িখানায় খাওয়া দেখা না কোথায় শিল্প গড়নে শিল্পের উন্নতি হবে সেই সব দেখা! আবার এই সরকারই করের মাধ্যমে অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য একশো মিটার অন্তর মদের লাইসেন্স দিয়ে বেকারদের সাকার করার ব্যবস্থা করেছেন। তাহলে মানে দাঁড়ালো কি? এই সরকার চোরকে বলছেন চুরি কর, আর গৃহস্থকে বলছেন সজাগ থাকো। আর মন্ত্রীরা যে বিলাতি মদের বারে গিয়ে বন্ধুবান্ধব ও ইয়ার দোস্ত নিয়ে গল্প করতে যান একথা যদি ওই সকল সাফাই কর্মীরা বলে তাহলে নিশ্চয়ই শিল্পমন্ত্রী রাগ করবেন না। কারণ ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় এটা জেনেই তো সাফাই কর্মীদের উদ্দেশ্যে ওই প্রকার অপমানসূচক অশালীন মন্তব্য করেছেন।

আসলে সিঙ্গুর থেকে টাটাদের চলে যাওয়াতে শিল্পমন্ত্রী সহ অপরাপর মন্ত্রীদের মাথার ঠিক নেই। অবান্তর, অবাস্তব, অশালীন ও অপমানকর মন্তব্য ও বক্তব্য চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই বলি কি সাফাইকর্মীরা গুঁড়িখানায় যাচ্ছে না সরাইখানায় যাচ্ছে সেটা না দেখে তারা যাতে সংসারখানার দিকে মনোনিবেশ করে, মন্ত্রী হিসাবে তার ব্যবস্থা করলে একটা কাজের মত কাজ করবেন। চেষ্টা করেই দেখুন না!

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী।

পঞ্চক্রোশী থেকে কাশী

উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা সাধারণভাবে পূর্ব-দক্ষিণ বাহিনী। কিন্তু বিখ্যাত তীর্থ বারাণসীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। এই উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থান করছে সুপ্রাচীন বারাণসী তীর্থনগরী। এখানে গঙ্গার পশ্চিমতটে দু'টি ছোটো নদী—বরুণা এবং অসি কয়েক কিলোমিটার ব্যবধানে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। বরুণা আর অসি নাম দু'টি মিলে হয়েছে 'বারাণসী'। বারাণসীর প্রাচীন মূল নাম কাশী। কাশী নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রথম মত হলো ঃ আজ থেকে প্রায় ৩২০০ বছর পূর্বে কাশ বা কাশ্য নামের রাজা এই নগরীর পত্তন করেন এবং তাঁর নাম অনুসারে নগরীর নাম হয় কাশী। দ্বিতীয় মত হিসেবে, 'কাশ' শব্দের অর্থ আলোর উজ্জ্বলতা। এই কাশ শব্দ থেকে কাশী নাম আসতে পারে। যাই হোক, কাশী নামের সন্ধানে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের সাহায্য নিতে হবে। উল্লেখ্য, বারাণসীর প্রধান মন্দিরের নাম কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং কাশী নামে এখানে একটি রেল স্টেশনও রয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য কাশীখণ্ডে 'পঞ্চক্রোশ প্রমাণ' এবং শিবপুরাণে 'পঞ্চক্রোশী' বলা হয়েছে কাশীকে। উল্লেখ্য, বারাণসীতে কাশী প্রদক্ষিণ করা অর্থাৎ পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করাকে পুণ্য কাজ মনে করা হয়। এই পঞ্চক্রোশ বা পাঁচ ক্রোশ হচ্ছে বর্তমান মাপ অনুযায়ী ১৮ কিলোমিটারের থেকে কিছু বেশি দূরত্ব। এই পাঁচ কোশের পথ জানা দরকার। বারাণসীর মানচিত্র থেকে জানা যায়, গঙ্গার উত্তরে গঙ্গা-বরুণার সঙ্গমস্থল থেকে দক্ষিণে গঙ্গা-অসির সঙ্গমস্থল দু'টির মধ্যস্থলে রয়েছে প্রাচীন ঘাটগুলি। একসময় হয়তো গঙ্গাপথে নৌকাযোগে উল্লিখিত দু'টি সঙ্গমস্থলের মধ্যে যাওয়া ও আসার মোট দূরত্ব পঞ্চক্রোশ হতে পারে। এছাড়া অন্য পথও থাকতে পারে। এর জন্য গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই বিষয়ে সুধী পাঠক সমাজের কিছু জানা থাকলে অবশ্যই জানাবেন। তবে এটা ঠিক যে, কাশীধামের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। এই পঞ্চকোশী কথাটি কালক্রমে সংক্ষেপে ক্রোশী হয়ে যায়। ক্রোশী থেকে কাশী হওয়া খুবই সহজ। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কাশী নাম-রহস্যে লুকিয়ে আছে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমাটি।

—রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

অধ্যাপক প্রণব রায়কে সাম্মানিক ডি-লিট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের স্বনামধন্য প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন সচিব প্রণব রায়কে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি প্রদান করল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চদশ সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল শ্রী এম কে নারায়ণন। সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্যের অভিভাষণে উপাচার্য স্বপন কুমার প্রমাণিক প্রণব রায় সম্পর্কে বলেন, শিক্ষকতার পাশাপাশি অধ্যাপক রায় পুরাকীর্তি, টেরাকোটা, মন্দির স্থাপত্য কীর্তি এবং পাটশিল্প বিষয়ে মৌলিক

রচনার মধ্যদিয়ে উক্ত বিষয় সমূহে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ এবং অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু তাই নয়, মেদিনীপুর জেলার একজন কৃতী সন্তান হিসেবে অধ্যাপক রায় মেদিনীপুর জেলার বিশেষত ঘাটাল মহকুমার আঞ্চলিক ইতিহাস উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। উল্লেখ্য, অধ্যাপক প্রণব রায়ের জন্ম ১৯৩৭ সালের ২৭ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাশপুর থানার বাসুদেবপুর গ্রামে। আনন্দবাজার, দেশ, স্টেটসম্যান, স্বস্তিকাসহ দেশ-বিদেশের বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা এবং লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', 'বাংলার খাবার', 'বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' উল্লেখযোগ্য।

পরম্পরা

শাশ্বত রাত্রির বুকে

শিপ্রা দস্তিদার

মহাপরিনির্বাণের পর থেকে হাজার বছর ধরে বুদ্ধ-বন্দনা, বুদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আসছে বুদ্ধানুরাগী অগণিত মর্তবাসী মানুষ। জাতক, অবদান, বুদ্ধ চরিত ইত্যাদি রচনায় কল্প-কল্পান্তর ব্যাপী তাঁর বুদ্ধ হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উদীচ্য ও থেরবাদী মতে বহু সূক্ষ্ম দার্শনিক, তাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও বুদ্ধ ঘোষিত মূল বাণী অবিকৃত রয়েছেপ্রায়। প্রজ্ঞা, উপেক্ষা, করুণা ও বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ— এই দুই যানের মূল আশ্রয়। বৌদ্ধ যুগে এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার প্রায় সমুদয় অঞ্চলে বুদ্ধবাণীর আশ্রয়ে মানুষ আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা করেছে। আজ সেই যুগের অবশিষ্ট কিছুই নেই—কিন্তু বুদ্ধানুগামী মানুষ আছে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে—তাঁরা কি সত্যিই বুদ্ধকে অনুগমন করেন? এই প্রশ্ন করা যায়। তাঁকে এশিয়ার 'আলো' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। তাঁর বাণীতে পরিশুদ্ধ হয়ে 'চণ্ডাশোক', 'ধর্মাশোকে' রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এই বুদ্ধকেই প্রণাম জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কবিকুল। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল, শামসুর রহমান, অন্নদাশংকর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে ব্রত চক্রবর্তী পর্যন্ত বিখ্যাত ও খ্যাত সকলেই। কবির মনোলোকে বুদ্ধের যে অবস্থান তার নিরীখে বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে মানবসভ্যতার চলচ্ছবি চিনে নেওয়া যায়। সভ্যতার ইতিহাসে এই বিশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিস্ময়কর। বিস্ময়কর এই শতকের শুরু থেকে পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম। আবার শক্তির দম্ভে অনড় দুই গোষ্ঠীর মধ্যকার পৃথিবী জুড়ে মারণযজ্ঞ। এত অগ্রগতি, মানবমুক্তির জন্য এত ত্যাগ যুদ্ধের যূপকাষ্ঠে কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুকে রোধ করতে পারেনি।

এই শতাব্দীর প্রজ্বলন্ত আগুনের মধ্যে বাস করতে করতে কবির মনে হয় মানুষের কামনার আতিশয্যে দেশে দেশে যুগ যুগান্তরে কঠিন থেকে কঠিনতম দ্বন্দ্ব সূচিত হচ্ছে ঘরে ঘরে;এই কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাতে মানুষ—

দুঃখীর আশ্রয় বাসা
নিশ্চিন্তে, ভাঙিয়া আনে দুর্দ্দাম দুরাশা হোমানলে
আহুতি ইন্ধন যোগাইতে;
নিঃসঙ্কোচে গর্বে বলে আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো;

দুর্দাম বাসনার নিবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে মানুষ নিজেই নিজের জন্য সৃষ্টি করেছে অজস্র, অগণন দুর্ভোগ। রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বেদনায় দীর্ণ হয়েছে।

এই বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ-আকাঙ্ক্ষায় কবির মনশ্চক্ষে নিত্যকালের সর্বত্যাগী অনন্ত তপস্যামগ্ন বুদ্ধের ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। প্রার্থনা জাগে;

ভরসা হারালো যারা যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস
তোমারি করুণা চিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ।

হাজার বছরের ইতিহাসের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আর এক কবি এই ভরসা হারানো মানুষের জন্য 'আরও আলো' চেয়েছেন। ইতিহাসের মর্ম থেকে এক উজ্জ্বল আলোর বর্তিকা জ্বালাতে চেয়েছেন। সেই আলোর মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—

ধর্মাশোকের স্পষ্ট আকাশের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সংঘের দিকে—ধর্মে নির্বাণে,
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

'এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি বুদ্ধ বীর' বলে নজরুল তাঁকে বীরের মর্যাদা দিয়েছেন। মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে শিষ্য আনন্দকে স্থিতপ্রাজ্ঞ তথাগত বলেছিলেন, 'আত্মদীপ হও'। নিজেকেই নিজের আশ্রয় কর। মানুষের সমাজের পার্থিব দুঃখকেই তিনি দুঃখ জ্ঞান করেছিলেন। অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ না করে সর্বার্থে মধ্য পথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যেই আত্মসমালোচনা ছিল। বিরুদ্ধ বাদীদের উদ্দেশ্যে শেষ কথা বলেছেন, হে বিরুদ্ধ বাদীরা, আমি অন্তর্যামী, আবার অন্তর্যামী নইও। কিছু অনুমান করতে পারি, কিছু পারি না। বিপুল চরিত্রজ্ঞান, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর করুণা দিয়ে পৌঁছুতে পারি অনেক সময়েই দ্বন্দ্বের মূলে। সমস্যার মূলে। আমি যেখানে পৌঁছেছি ধ্যানস্তিমিত সেই প্রশান্তির পারাপারে বিক্ষোভ ওঠে না। তবু চেষ্টা করেছি লোকচিত্তের কাছাকাছি থাকতে। লোক ভাষায় কথা বলতে' (*মৈত্রেয় জাতক, পৃ. ৪৩০*)।

এমন অকপট, সরল উক্তি বীরেরই উক্তি। আত্মদীপ জ্বালিয়ে যে সত্যস্বরূপ অন্বেষণ করেছিলেন তা মূলত মানুষের মধ্যে যে কল্যাণব্রত রয়েছে তার সারাৎসার। মানুষের নিজের হাতেই তার নিজের কল্যাণের ভার ন্যস্ত। কবিও তাই চান—

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান
কে ভগবান?
আত্ম-জ্ঞান।

শত শত সাম্রাজ্যের ওঠা-নামার মধ্যে যারা কাজ করে তাদের শ্রমেই মানুষের মুখে অন্ন জোটে—এই অগণিত মানুষই পরম ধৈর্যে ও শ্রমে সভ্যতাকে নির্মাণ করে—নিজেদের অজান্তেই তারা সভ্যতার ধারক; বুদ্ধ প্রদর্শিত পথেরও। কিন্তু জন্মভূমিতে বিস্মৃত বুদ্ধ নানা দেবতার বেশে পূজিত হন—

হে বুদ্ধ তোমায় আজ ভুলেছে স্বদেশ।
কিন্তু তবু রয়ে গেছে মহিমার বেশ।
(*অন্নদাশঙ্কর রায়*)

এই মহিমা আছে জেনেই তো কবি উচ্চারণ করেন—

যত পিছু হটে যুদ্ধ।
ততই এগোন বুদ্ধ। (*সুভাষ মুখোপাধ্যায়*)

পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে সদ্ধর্মের মহিমা বজায় থাকবে, একথা বুদ্ধ বলেছিলেন। তারপর সদ্ধর্মের মহিমা অন্তে মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ জাগিয়ে আসবেন মৈত্রেয় বুদ্ধ। অমারাত্রির দুর্গতোরণ ভেঙে নবজীবনের আশ্বাস নিয়ে দেখা দেবে 'মানব-অভ্যুদয়'। কোথায় কোন দেশে কোন সমাজের সংঘশক্তির মধ্যে মৈত্রেয় জাত হবেন তা কবিরাও জানেন না। তাই দেখে—

যুগ ঘুরে যায়, মানুষের পোশাক বদল হয়
মানুষের বাসনা তবু ভুল হাওয়ায় ওড়াওড়ি করে।
আদর্শের ছদ্মবেশ পরে পাশব স্বার্থ
অসংখ্য অঙ্গুলিমাল হিংস্র লোভ নিয়ে
ওত পেতে আছে—
(*সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*)

এক অঙ্গুলিমালের জায়গায় সহস্র, লক্ষ মুণ্ডমালাধারী পূর্ব ইউরোপে, আফ্রিকায় কাপালিক সাধনায় রত। মানুষের অন্তর্গত বুদ্ধকে হত্যা করে মারের সন্তান ছলা, কলা ও কামনা যে যুগের প্রতিভু সেখানে 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া আর কোন সুখ নাই।'

সমকালীন ভারতের অসহিষ্ণুতা,

।। ভগবান বুদ্ধ দেবের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।।

বহুধাখণ্ডিত মূল্যবোধ, হিংসা, মিথ্যাচার ও চরম নৈরাজ্য অনতিদীর্ঘ কবিতায় প্রকাশ করে কবিরুল ইসলাম আবাহন করেছেন—

এসো বুদ্ধ, ত্রাণ করো তোমার স্বদেশ
মানুষ মনুষ্যত্বে দাও নব পাঠ—
ঘুছে যাক ভেদাভেদ ঃ লৌকিক প্রতিভা
জ্বালুক তোমার দেশে অলৌকিক বিভা।

নতুন যুগের বুদ্ধ একজন নয়, সমগ্র পৃথিবীতে অনেক অনু-বুদ্ধ জন্মালে সেই বুদ্ধ সংঘই পারবে আত্মদীপ জ্বালাতে। বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় আলো মানুষের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠবে। বহুজনের আত্মদীপের আলোয় বুদ্ধ হেসে উঠবেন।

এই বোধি মানুষের কল্যাণময় সংঘশক্তির বোধি, যা ঢিল ছুঁড়ে দেবে নীল শকুনির মুখে। মার-এর প্রলোভনের উত্তরে কঠিন তপশ্চর্যারত বুদ্ধ বলেছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চ লিষ্যতে।

শরীর শুকিয়ে যাবে, ত্বক, অস্থি, মাংস বিলীন হয়ে যাবে বহুকল্পদুর্লভ বোধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত আসন থেকে তাঁর দেহ নড়বে না। পার্থিব দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করে মনুষ্যত্বের মহিমায় মানুষ উপনীত হোক এই তাঁর মূল বাণী। মধ্যম পথের নির্দেশ নিলেও বুদ্ধ নিজে কঠিন অস্থিচর্মসার তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। কবিদের সম্মিলিত সংঘশক্তি কি এমন উদ্যোগ নিতে পারে। আজ চারিদিকে 'নিষাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভয়ার্ত বাতাস কাঁপে', কেন না—

বৃক্ষ নেই, ছায়া নেই, ধ্যানযোগ্য চোখের পাতাও;
আমারই ভেতরে তবু গৌতমের চোখে নেই ঘুম।

দু'রকম কথা বলে নির্বাণের প্রশ্নে জোনাকিরা
নিষ্ঠুর কাঠুরে আমি নিজ হাতে কাটি বোধিদ্রুম। (*ময়ুখ চৌধুরী*)

সমসময়ের চেহারা রাত্রির দানবী, ছিন্নমস্তা চামুণ্ডার মতো যার মাথা নেই, বক্ষ নেই, হাত নেই। শুধু তার উদর থেকে 'নগ্ন মুণ্ডহীন মনুষ্যশরীর' জন্মায়;কালান্তক, ভীষণ এক সময়ের প্রেক্ষাপটে সুজাতার পায়সান্নের অধিকার বঞ্চিত, জেতবনের শান্তির আশ্রয় দুর্লভ জেনেও আশ্রয় ভিক্ষা করতে দ্বিধা করেন জয় গোস্বামী।

ফুলের সঙ্গে ফুল জুড়ে দিয়ে যেমন মালা গাঁথা হয় তেমনি সুকর্মের পর সুকর্ম দিয়ে মালা গাঁথার উপদেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধ। বৈর দিয়ে নয়, অবৈর দিয়েই বৈর জয় করা সম্ভবপর। কালের বিবর্তনে বুদ্ধ-বাণী নয় মন্দিরই ধর্মাচরণের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে; বুদ্ধকে বিগ্রহরূপে, ভগবান রূপেই বন্দনা জানানো হয়। আজ বাণীর চেয়ে বিগ্রহ, সদাচরণের চেয়ে আনুষ্ঠানিকতাই সর্বার্থ সাধক।

তুমি বলেছিলে
আত্মদীপ হও
অন্তরের আলোয় পথ দেখে চলো।
আমরা কিন্তু সেই আলোকে আড়াল করে—
অন্ধকারে পথ চলতে ভালবাসি। (*জ্যোতিভূষণ চাকী*)

একদিন যাকে এশিয়ার আলো মনে করা হয়েছিল, ইতিহাসে তাঁকে পৃথিবীর প্রথম বিস্ময় মনে হয়েছে, দীর্ঘ পঁচিশ শতক পরে—

মৈত্রীর সকল সাঁকো দিকে দিকে পড়ে ভেঙে
পৃথিবীর বোধিবৃক্ষ কেটে কেটে নিঃশেষে জ্বালানি
আমাদের ঘিরে আছে অন্তহীন দুঃখের আকাশ। (*হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী*)

দুই শব্দহীন শেষ সমুদ্রে মাঝখান সচল যে বর্তমান তাকে অর্থপূর্ণ করে গড়ে তোলাই শ্রেয়;জীবন তো খণ্ড, ক্ষুদ্র মুহূর্তের সমষ্টি। সদ্যজাগ্রত বর্তমান বাস্তব ও শরীরীভাবে, তীব্রভাবে স্পন্দমান। তলস্তয়ের এই উচ্চারণের মধ্যে তথাগতের সমস্বর বেজে উঠেছে—

যা গড়বার গড়ে নাও এখন এখনই
এমনই বলতেন তলস্তয়
সেই স্বরে শোনা যেত গৌতম বুদ্ধের স্বরধ্বনি (*তপনজ্যোতি বড়ুয়া*)

রবীন্দ্রনাথ থেকে শামসুর রহমান, জয় গোস্বামী থেকে তপনজ্যোতি বড়ুয়া প্রায় সবাই আশ্রয় চেয়েছেন—একটা স্থিতধী মানবসমাজের জন্য। সকলের আকুতি নির্ভেজাল, কিন্তু কবিদের কি সংঘশক্তি আছে যে সংঘের মধ্যে গোত্রযুগের সাম্য ফিরিয়ে আনবেন? কবিরা পৃথিবীতে শান্তি এনে দিতে পেরেছে ইতিহাস তেমন সাক্ষ্য দেয় না। কবিদের বোধিহীন চোখের পাতায়ও মরীচিকা জড়ো হয়ে আদমের মৃন্ময় আপেলে পার্থিব বাসনার ছায়া দুলে ওঠে। তা সত্ত্বেও এক মিনিট স্থির হয়ে বসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যান কবি। সেই চেষ্টাই অনবরত করে যেতে হয় কবিকে। বিশ শতকের মধ্যভাগে জীবনের রূঢ়তার অনেক রৌদ্র মেখে গ্রীক, হিন্দু, ফিনিশীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী কবি এক স্থিতধী মানব সমাজের আকাঙ্ক্ষায় উচ্চারণ করেছিলেন—

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ—

অগণন মানুষের জীবনের মূল্যে যে সভ্যতার ভিত তৈরি হয়েছে বুদ্ধ, কনফুশিয়াস তো সেই মানুষেরই পিতা। তাই এক ইঞ্চি করে বুদ্ধ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাটাই চির জায়মান থাকে। কেননা—

শ্বাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ অনোমা ২০০৮, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

এক সব্জিওয়ালীর 'বড়' হয়ে ওঠার কাহিনী

ইন্দিরা রায়

ফ্ল্যাশব্যাকে এক নম্বর ছবি—মধ্য কলকাতার তালতলা বাজারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে আসা মুসলিম দরিদ্র পরিবারের ছোট্ট মেয়েটি মার সঙ্গে এসে আনাজ বিক্রি করছে। ফ্ল্যাশব্যাকে ফুটে ওঠা দ্বিতীয় ছবি—ছোট্ট মেয়েটিকে খুঁজে বার করেন বিখ্যাত পাঞ্জাবি চিত্রশিল্পী পানেসর। তার হাতে তুলে দেন কাগজ পিজ বোর্ড। আর তার পরের ছবি? সেখানে দেখা যাচ্ছে মেয়েটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছে কোলাজ শিল্পী হিসেবে। জার্মানির প্রদর্শনীতে প্রশংসিত মেয়েটির ছবি। সেই মেয়েটি আজকের দেশ-বিদেশের আঙ্গিনায় আদৃত ও প্রশংসিত শাকিলা বিবি।

কোনওদিনই ভাবতে পারেনি শাকিলাবিবি যে একদিন সে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাবে। সে ভাবনাটা ভাবা সম্ভব তো ছিলই না, এমনকী তার ভেতরের সুপ্ত প্রতিভার কথা সে নিজেও জানত না। এভাবে শিল্পী হয়ে ওঠার নেপথ্যের কথা শোনাও গেল শাকিলা বিবির কাছে— দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মগরাহাটে আমার জন্ম দরিদ্র মুসলিম পরিবারে। অভাব-অনটন ছাড়াও ছিল পারিবারিক সমস্যা। বাবা আরেক মহিলাকে বিয়ে ক'রে চলে যান ঢাকায়। মা একার লড়াই-এ আমাদের বড় করে তোলেন। একে মুসলিম গোঁড়া সমাজ, তার ওপর দারিদ্র্য আমাদের সব আলো কেড়ে নিয়েছিল। মার সঙ্গে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ি আমি। তালতলার বাজারে মার সঙ্গে সবজি বিক্রি করতে আসি। পড়াশোনা শেখা তো দূরের কথা—মুসলিম সমাজে মেয়েদের ওপর সবধরনের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। জানি না কোনওদিনই আমি এই সমাজে থেকে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারতাম কিনা, যদি না উদারমনা হিন্দু পাঞ্জাবি চিত্রশিল্পী বি. আর পানেসর আমাকে খুঁজে বার করতেন।

সত্যিই তো 'শাকিলা' হওয়া সম্ভব হোত না পানেসরের উদার সহৃদয়তা না থাকলে। তিনি শিল্পী, সেই শিল্পীর দৃষ্টিতে শিশু প্রতিভা অন্বেষণ করা ছিল তাঁর কাজ। এমনিভাবে তালতলার সবজি বাজারে ছোট্ট মেয়ে শাকিলাকে খুঁজে পান। তার হাতে লজেন্সের পরিবর্তে তুলে দেন পেনসিল আর খাতা। ফুটপাতের কোনায় বসে রেখায় মেয়েটি যে ছবি এঁকেছিল, তা পানেসরকে মুগ্ধ করে এবং সেই প্রতিভা পূরণের জন্য চলে তার সাধনা।

শিক্ষাগত জ্ঞান ব্যতিরেকেই মনের খেয়ালে যেসব কাগজ সেঁটে ছবি তৈরি করত তা সে নিজেই জানত না বুঝত না তার গভীরতা কতখানি। সরলমনে ছবিগুলো সে দেখাত তার শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা পানেসরকে, যাঁকে 'বাবা' সম্বোধনে ডাকেন তিনি। বিশেষ করে তিনি শাকসবজি বাজারের পরিচিত ছবিটাকে রঙিন কাগজ সেঁটে এমন এক কোলাজ তৈরি করেন যা শিল্পী পানেসরকে মুগ্ধ করে। ছবিটায় ছিল বেগুন, কাঁচালঙ্কা, টমেটো, কাঁচা-পাকা পেপে। তাঁর পরিচিত শিল্পীমহলে তিনি তা দেখান। শিল্পীমহলের গণেশ হালুই, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, শ্যামল দত্ত রায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মুগ্ধ হলেন সবাই। এই ছবি বিড়লা অ্যাকাডেমি এবং অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হলো। নির্বাচিত ও পুরস্কৃতও হলো। সময়টা ১৯৯০। ইতিমধ্যে মুসলিম পরিবারের গোঁড়াতন্ত্রে বিয়ে হয়ে যায় এবং ৯০-এর দশকেই সে রীতিমত তিন সন্তানের জননী। এমনকী বিবাহিত পুরুষের সঙ্গেই তার সহাবস্থান ঘটে। এমন এক পরিবেশ তার পক্ষে প্রতিকূল ছিল। এক্ষেত্রেও এসেছিল নানা বাধাবিপত্তি। তবু শাকিলার স্বীকারোক্তিতে উঠে আসে—'আমার মনের জগৎকে যদি 'বাবা' উপলব্ধি না করাতেন, যদি আমাকে গুরুত্ব না দিতেন, তাহলে আমি আজ আলো দেখতে পেতাম না। এ সঙ্গে অবশ্যই মানতে হয় যে 'বাবা' ছিলেন হিন্দু সমাজের উদারমনা শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ।

এরপর থেকে চলতে থাকে শাকিলার পিজবোর্ডে কাগজ সেঁটে কোলাজের কাজ। ধীরে ধীরে নিজের দেশের বাইরে বিদেশেও ঘটতে থাকে তার কাজের পরিচিতি। এর মূলে অবশ্যই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে শাকিলা রাখি সরকারের নাম। সিমা আর্ট গ্যালারির কর্ণধার। শাকিলার ছবি বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা উনিই করেন। এছাড়া, প্রদর্শনীতে শাকিলার ছবি রাখার ব্যাপারে ওনার সাহচর্য এবং প্রধান ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৯০-তে প্রথম প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস-এ, এরপর থেকে ২০০৭ পর্যন্ত এবং এখনও পর্যন্ত সমস্ত সাংসারিক জটিলতা, বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি অবিশ্রাম কাজ করে চলেছেন এবং স্বীকৃতিও পেয়েছেন। কিন্তু এই স্বীকৃতি তার ঘোমটার আড়ালে থাকা সলজ্জ ভাবমূর্তিকে এতটুকু বদলে দিতে পারেনি। তাঁর কোলাজের বৈশিষ্ট্য হলো; গ্রামীণ সৌন্দর্য চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং তারই পাশাপাশি আজকের বিশ্ব সন্ত্রাসকে পরিস্ফুট করে তোলা। লৌকিক সমৃদ্ধ আধুনিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন শাকিলা তাঁর করা কিছু ইনস্টলেশন-এর মধ্য দিয়ে। জার্মানির হ্যানওভারে এক শিল্পীমেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু তার কাছে এ সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। তাঁর ছবিতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ছবি পরিস্ফুট। পুরস্কার প্রাপ্তি প্রচুর। সব পুরস্কার প্রাপ্তির কথা জানানো সম্ভব নয়। তবে এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য-নাট্য অ্যাকাডেমি, দিল্লির ললিতকলা অ্যাকাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ চারুকলা প্রদর্শনী, রাজস্থান ললিতকলা অ্যাকাডেমি উল্লেখযোগ্য।

শাকিলার জীবন ও শিল্প নিয়ে ইতিমধ্যে এক তরুণ চিত্র পরিচালক শঙ্খ ঘোষ তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। শাকিলার জীবনচর্চা ও চর্যা সাধারণ মানুষের কাছে অনুপ্রেরণাস্বরূপ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই স্ব-প্রতিভাকে তুলে ধরা যায় শুধুমাত্র নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের জোরে। তাই তো খ্যাতি পুরস্কার তাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। সে তার কাগজ গাঁটার জগতে নিমগ্ন।

আপনার এই সহজাত প্রতিভা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে কি প্রভাবিত হয়েছে, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'আমার তিন ছেলেমেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে পড়ালেখা করে। ছোট ছেলের মধ্যে দেখছি এ ধরনের কাজ করার আগ্রহ। কিন্তু পড়াশোনায় মন নাই।'

শাকিলা বিবি

শাকিলা বিবির আঁকা ছবি।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।। ১১

সারা শরীরে ঘা নিয়ে সনাতন একা একা থাকে। একদিন মহাপ্রভু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলে সনাতনের সব ঘা মিলিয়ে যায়। সনাতন সুস্থ হলেন।

মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় গোবর্ধন শিলা আর রুদ্রাক্ষের মালা রঘুনাথ দাসকে দান করলেন।

রঘুনাথ দাসের হাত থেকে পচা প্রসাদ তিনি কেড়ে খেলেন।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

‘কলকাতা পুর-নির্বাচনে ভাল ফলের আশাবাদী বিজেপি’

একান্ত সাক্ষাৎকারে মীনাদেবী পুরোহিত

একাধারে কর্পোরেশনের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র, অন্যদিকে বিজেপি নেত্রী। তাই সিপিএমের প্রশাসনিক ত্রুটি আর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দুই-ই তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত। চূড়ান্ত প্রচার-ব্যস্ততার ফাঁকেই মীনাদেবী পুরোহিতের মুখোমুখি স্বস্তিকার প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

❑ আসন্ন পুর-নির্বাচনে কলকাতার ক্ষেত্রে বিজেপি-র ভূমিকাটা ঠিক কি? মানে বিজেপি ঠিক কি উদ্দেশ্যে এখানে লড়াইটা করছে?

● দেখুন, বিজেপি একটি জাতীয় দল। জাতীয় দলের কর্তব্যই হলো মানুষের পাশে থেকে লড়াই করা। ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলের যা যা সমস্যা সে সম্পর্কে আমরা যথেষ্টই অবহিত রয়েছি। শহরের মানুষের আর্থিক সুবিধা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এনে দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং নির্বাচনে আমাদের লড়তে তো হবেই। দ্বিতীয়ত, কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা করা হলো তার উত্তরে বলতে হয় এখানে আমরা (বিজেপি) এই মুহূর্তে নির্ণায়কের ভূমিকায় রয়েছি। সিপিএম বিরোধী জোট না হওয়ার কারণে কলকাতার বাম-বিরোধী জনগণের একাংশ যথেষ্টই ক্ষুব্ধ। সেক্ষেত্রে তাঁদের ভোট আমাদের বাক্সে প্রতিফলিত হওয়া আদৌ বিচিত্র কিছু নয়। সব মিলিয়ে কলকাতা পুরসভায় বাম-বিরোধী পুরবোর্ড গঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আমরা থাকতেই পারি।

❑ বিজেপি-র পুরবোর্ড যদি আগামীদিনে কলকাতা পুরসভা পরিচালনায় অংশীদারিত্ব পায় তবে কি কি নাগরিক পরিষেবা পুরবাসীর দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন?

● বাড়ি বাড়ি পানীয় জল এবং শহরের প্রতিটি প্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে আমরা দায়বদ্ধ। বাম পুর-বোর্ডের আমলে পানীয় জল সরবরাহের মান একেবারেই নেমে গিয়েছে। শহরের প্রায় প্রতিটি এলাকায় বিদ্যুতের লাইন থাকলেও, লোডশেডিং-এর দরুণ সেখানে অধিকাংশ সময়েই বিদ্যুৎ থাকে না। অসহ্য গরমে হাস-ফাঁস করেন মানুষ। আমরা এলে অবস্থাটা পাল্টাবে। আর আমাদের কলকাতার রাস্তাঘাট বড্ড নোংরা। সেগুলি ঝকঝকে-তকতকে করে তোলার ব্যাপারটাকেও প্রাধান্য দেব। কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়েছে। তাকে সারিয়ে তোলাটাও আমাদের কাছে এই মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ।

❑ আপনি একটা সময় পুরসভায় ডেপুটি মেয়র ছিলেন। সেই সময় বহু উল্লেখযোগ্য কাজও করেছেন। তাতে নিজের ওয়ার্ড কি অবহেলার শিকার হয়েছে?

● একেবারেই না। আমার ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা সম্পর্ক রয়েছে। যখন আমি ডেপুটি মেয়র ছিলাম, তখনও এটা যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আমি এই জিনিসটা ‘মেনটেন’ করে আসছি।

❑ গত পাঁচ বছরে সিপিএম পরিচালিত পুরবোর্ডের কাছ থেকে একজন কাউন্সিলার হিসেবে আপনি কখনও বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

● আমার ওয়ার্ডে পার্ক নিয়ে সিপিএম যা রাজনীতি করেছে তা জীবনে ভুলবো না। এখানে সি আই টি পার্ক আছে, মুখরাম কানোরিয়া পার্ক আছে; এই সমস্ত পার্কের উন্নয়নের জন্য সাত লক্ষ টাকার ফাইল আমরা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু মেয়র পারিষদ ফৈয়াজ আহমেদ খান আমাদের একটা টাকাও ঠেকালেন না। অথচ মহম্মদ আলি পার্কের উন্নয়নের জন্য তাঁরা ১ কোটি টাকা ঢেলেছেন। এর পেছনে রাজনীতি রয়েছে। আমরা বলেছিলাম বড়বাজারের এই পার্কগুলোকে নিয়ে কোনও রাজনীতি হতে দেব না। স্রেফ সমাজসেবার প্রয়োজনে ওগুলো ব্যবহৃত হবে। বাচ্চারা এখানে খেলাধূলা করতে পারবে। রাজনীতি নেই অথচ সিপিএম আছে—এই জিনিসটা অকল্পনীয়। তাই বোধ হয় একটা টাকাও পেলাম না!

❑ বিগত বাম-পুরবোর্ডের মুখ্য ব্যর্থতা হিসেবে কিছু চিহ্নিত করতে চাইবেন?

● প্রথমেই বলবো, রাজস্ব আদায়ে তাদের সীমাহীন ব্যর্থতার কথা। আমাদের পুরবোর্ড ইকোনমিক স্ট্রাটেজি হিসেবে বাজেট-ঘাটতি দেখিয়েছিল আর ওদের পুরবোর্ড বাজেট প্রকাশ করতে গিয়েই তো যত রাজ্যের টালবাহানা করলো! তারপর যখন বাজেট প্রকাশ করল তাতে দেখা গেল অসংখ্য গলদ, তার ওপর আবার তাতে বাজেট-ঘাটতিও রয়েছে। এক পয়সাও তারা রাজস্ব হিসেবে আদায় করতে পারেনি।

❑ আপনাদের সময়কার পুরবোর্ড কিভাবে রাজস্ব আদায় করত?

● ওয়েভার স্কীমের মাধ্যমে এককালে আমরা প্রচুর রাজস্ব আদায় করেছি। মানুষ টাকা না দিলে পুরসভা কোত্থেকে টাকা পাবে? প্রমোটারির কালো টাকায় আমার আমলের পুরবোর্ড কোনওদিনও ধান্দা করেনি। কলকাতার মানুষের দেওয়া অর্থেই আমাদের পুরবোর্ড চলেছিল।

❑ সারা কলকাতা জুড়েই অজস্র জতুগৃহের সন্ধান পাওয়া যাবে। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে যে আগুনে পুড়ে যাওয়া নন্দরাম মার্কেট ভেঙ্গে সংস্কারের কাজে আপনারা বাধা দান করেছেন।

● সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি নন্দরাম মার্কেটের সংস্কারের কাজে কোনও বাধা দিইনি। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমি, সুনীতা সহ বিজেপি-র সবাই সেখানে ছুটে গিয়েছি। অপদার্থ ফায়ার ব্রিগেড। জল দেবার পাইপ নেই। সিপিএম এত বড় বড় কথা বলছে অথচ তাদের কর্পোরেশন নন্দরাম মার্কেটের সেই আগুনে ঢালার জন্য এক ফোঁটা জলও দেয়নি। আমি এনিয়ে লড়েছি তাই আঁতে ঘা লেগেছে সিপিএমের। নন্দরামে পাঁচ দিন লাগাতার আগুন জ্বলতে থাকল কারণ ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা সেদিন আদৌ প্রশিক্ষিণ প্রাপ্ত ছিলেন না। আসলে গত তেত্রিশ বছরে রাজ্যের সবকিছুই ধ্বংস করেছে সিপিএম। শুধু কলকাতার পুর-প্রশাসনই নয়, গোটা রাইটার্সটাই তো পঙ্গু। সমস্যাটা সেখানেই। তাই আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও নন্দরাম মার্কেটের জন্য বাম পুরবোর্ড কিছুই করতে পারেনি। শুধু দোষারোপই করে গেছে।

❑ এবার পুর-নির্বাচনে ভাল ফল করা নিয়ে আপনারা কতটা প্রত্যয়ী?

● সম্পূর্ণ একশ’ ভাগ। ভাল ফল করার ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী আমরা।

পুর-নির্বাচনে শ্রীরামপুর পৌরসভা

সিপিএমকে ফেলতে ভাঙা জোটই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন শ্রীরামপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৩০ মে ২০১০-এ। গত ৭ মে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন উল্লেখযোগ্য কোনও প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে দেখা যায়নি। যদিও শেষ মুহূর্তে ওয়ার্ড-ভিত্তিক সমঝোতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গতবারে এই পৌরসভার মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫টি। এর মধ্যে দলবদলের জেরে সর্বশেষ স্থিতি হলো তৃণমূল ১০, কংগ্রেস ৯ এবং বামফ্রন্ট ৬ টি।

বর্তমানে আসন পুর্নবিন্যাসের ফলে মোট আসন ২৯টি। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সমঝোতা না হবার জন্য ২৯টি আসনে আলাদাভাবে প্রার্থী দিয়েছে দু-দলই। বামফ্রন্টও ২৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। উল্লেখ্য, এবার নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী সংখ্যা ১২। এই পৌরসভায় মহিলা সংরক্ষিত আসন ৯টি এবং তপশীলি মহিলা সংরক্ষিত আসন ১ টি।

গত লোকসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা ডাঃ রত্না দে (নাগ) চুঁচুড়াকেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। ডাঃ দে’র বিধান সভা নির্বাচন কেন্দ্রে উপনির্বাচন পরবর্তীতে নিয়মমাফিক হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোটের মনোনীত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ সুদীপ্ত রায় বিজীয় হন।

এবারের পৌরসভার নির্বাচনে যেহেতু কংগ্রেস-তৃণমূল সমঝোতা হয়নি তাই ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের অভিমত এটা বামফ্রন্টের পক্ষে সুবিধাজনক

(Advantage)। অপর একটি প্রচার পাশাপাশি চলছে যে বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কাছে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম বিরোধী বলে জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং বামেদের লাভ হওয়া দুরস্থান আর এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস আরও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ফলতঃ তৃণমূলের জয়জয়কার।

বিগত বিধানসভা উপনির্বাচনে এই পৌরসভা ক্ষেত্রে বিজেপির প্রচার ছিল চোখে পড়ার মতো। কর্মী ও নেতাদের মেলবন্ধন ও পারস্পরিক সমঝোতা বিজেপি সম্বন্ধে মানুষের কাছে নতুন বার্তা নিয়ে এসেছিল। এইবার মোটের উপর বিজেপি শিবিরের সক্রিয়তা গতবারের তুলনায় কম বলে মনে হচ্ছে। তবে নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রচার অভিযান জোরালো হবে এটা প্রত্যাশিত। সুতরাং বিজেপিও যে পিছিয়ে থাকবে না এটা বলা যেতে পারে।

এই নির্বাচনে স্বভাবতই তৃণমূল খুবই আত্মবিশ্বাসী, বামফ্রন্ট গতবারের তুলনায় ভাল ফল করবে বলে বিভিন্ন দলীয় সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। বিজেপি কয়েকটি আসনে উল্লেখযোগ্য ভোট পাবে বলে দলীয় নেতাদের ধারণা। যাই হোক, সবদলই তাকিয়ে আছে আগামী ৩০ মে’র দিকে যেদিন এই পৌর সভার প্রায় দু’লক্ষ ভোটার তাঁদের পছন্দের দলীয় বা নির্দল প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন। এই পৌরসভা কখনও বামফ্রন্ট কখনও অ-বামফ্রন্ট পরিচালনাধীনে থেকেছে। কোনও বোর্ডই এই পৌর এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিশেষ সাফল্য পায়নি। তাই যারাই বোর্ড গঠন করুক না কেন সাধারণ মানুষ এনিয়ে খুব একটা আশাবাদী নয়।

‘সক্ষম’-এর ভক্ত সুরদাস জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিবন্ধীদের উন্নতিকল্পে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ‘সক্ষম’-এর উদ্যোগে গত ১৬ মে সন্ধ্যায় ভক্ত কবি সুরদাস জয়ন্তী পালিত হলো। মানিকতলার নরেশ ভবন সভাগৃহে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সুরদাসের জীবনের বিভিন্ন দিক ও প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাসুদেব পাল। পরাধীন ভারতে সন্ত সুরদাসের মতো ভক্তিমার্গের সাধকেরা তাঁদের জীবন ও কর্মের দ্বারা ভক্তিভাবের প্রচার করেছে। বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্ম সে যুগে সমাজকে পথ প্রদর্শন করেছে। সুরদাস অন্ধ হয়েও পঞ্চ দশ শতক ও ষোড়শ শতকে মুসলিম শাসনাধীন ভারতে তাঁর রচিত লক্ষাধিক দোহা বা গানের মাধ্যমে ভক্তিভাবের প্রচার করে গেছেন। তাঁর সেই অবদান অমূল্য। ‘সক্ষম’-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সনৎকুমার রায় ও অজয় বিশ্বাস। সব মিলিয়ে যেন এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান।

ফায়দা লুটবে কে?

(২ পাতার পর)

তৃণমূলের ভাঁটার টানে অনেক আবর্জনা কংগ্রেসকে ভরিয়ে দেবে, আবার উল্টোটা হলে কংগ্রেসের অনেক আবর্জনা তৃণমূলকে ভাসিয়ে দেবে। এমন অবস্থায় মমতাকে অনেক ঝক্কি পোহাতে হবে আগামীদিনে তাঁর ইঙ্গিত এখনই পাওয়া যাচ্ছে। তাই ২ জুনের পর আগামী এক বছর এরাজ্যে কী ঘটে, রাজনৈতিক সমীকরণ কী হয় তারই প্রতীক্ষায় হতাশাগ্রস্ত বঙ্গজ মানুষ।

শব্দরূপ - ৫৪৮

অনিকেত ভদ্র

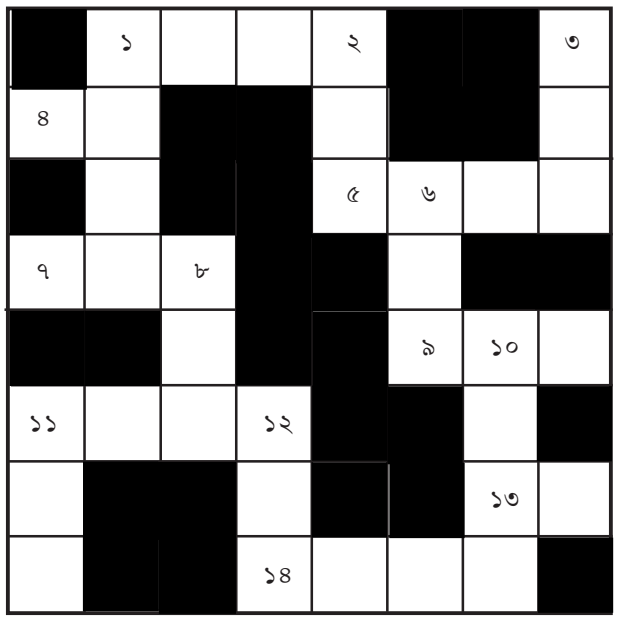

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শিব, বিশেষণে মঙ্গলকারী, ৪. জনক, বাবা, ৫. শ্রীকৃষ্ণের পিতা, ৭. গঙ্গাদেবীর বাহন, ৯. পৌরাণিক মুনিবিশেষ, সূর্যবংশের কুলগুরু, ১১. চণ্ডীস্তব, সাতশত শ্লোকবিশিষ্ট দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, ১৩. দানব-এর কথ্যরূপ, অপদেবতা, ১৪. যমুনা, সূর্যের কন্যা।

উপর-নীচ ঃ ১. নকুলের পুত্র, দুয়ে-চারে নিশানা, ২. রুদ্রবীণা ফারসি শব্দে, আগাগোড়া শব্দ, ৩. যদু বংশের পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ, ৬. কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানর রাজ, ইনি বালির কনিষ্ঠভ্রাতা, ৮. স্ত্রীর পরিচয়ে বিষ্ণু, ১০. শিক্ষক, ১১. সূর্য, ১২. জেলে জাতি, ব্যাধ, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪৬

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
রাজেশ দাস
বাগুইআটি
কলকাতা-৭০০০৫৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

দী	প	শ	লা	কা	■	■	■
■	ল্ল	■	■	ও	■	অ	জ
অ	ব	নী	■	য়া	■	■	বা
■	■	ত	■	জ	প	মা	লা
এ	ক	ল	ব্য	■	র	■	■
কা	■	■	ব	■	খ	চি	ত
গ্র	ন্থ	■	চ্ছে	■	■	কু	■
■	■	■	দ	ণ্ড	কা	র	ণ্য

● ৫৪৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ জুন, ২০১০ সংখ্যায়

ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে চান গিল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। আই ও এ সহ সব খেলার জাতীয় সংগঠন ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চান কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী এম এস গিল। বহুদিন পর ভারতবর্ষ এমন এক ক্রীড়ামন্ত্রী পেয়েছে যিনি সত্যিই খেলা ভালোবাসেন এবং দেখতে চান ভারতবর্ষকে জগৎসভায় উচ্চাসনে। তাই তিনি ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরেছেন, আর তাতেই শোরগোল পড়ে গেছে গোটা দেশে। আই ও এ এবং বিভিন্ন খেলার জাতীয় সংস্থার মাথায় এমন কয়েকজন তাদের মৌরসীপাট্টা কায়েম করে রেখেছেন যাদের হঠাতে না পারলে এদেশের ক্রীড়া সংস্কৃতির কোনও হিতসাধন হবে না।

দু'যুগের বেশি সময় ধরে সুরেশ কালমাদি এদেশের অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে আছেন। অথচ বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের স্থান কোথায়? স্বাধীনতার ষাট বছর পর ২০০৮-এ বেজিং অলিম্পিকে প্রথম আমরা এক সঙ্গে তিনটি পদক পেলাম, অথচ আমাদের সঙ্গেই স্বাধীন হওয়া চীন ওই অলিম্পিকেই এক নম্বর স্থান থেকে সরিয়ে দেয় সুপার পাওয়ার আমেরিকাকে। আর বেজিংয়ে যে অলিম্পিক সংগঠিত করেছিল চীন, তা এককথায় অবিশ্বাস্য যেন কল্লোলদের রূপকথা।

কে পি এস গিল দুই দশক ভারতীয় হকিকে শাসন করছেন। তার ফল কি হয়েছে তা আর ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের জাতীয় খেলাটির গুরুত্ব ও মহিমা দেশবাসীকে ভুলিয়ে ছেড়েছেন গিল। শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের চাপে তাকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয় আই ও এ। বিদেশ থেকে চাপ না এলে আরও কয়েকবছর হকি ফেডারেশনে অনাচার চালিয়ে যেতেন গিল। তেমনি ভলিবল ফেডারেশন, অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন, তিরন্দাজি ফেডারেশন সব জায়গাতেই অপদার্থ স্বার্থান্বেষী ধান্ধাসর্বস্ব কর্তারা রাজ করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে একমাত্র তিরন্দাজিতেই ভাল পারফরমেন্স হয়ে আসছে নানা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। বাকি সব খেলার আন্তর্জাতিক ট্র্যাক রেকর্ডের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।

কয়েকবছর আগে এদেশের অ্যাথলেটিকের অন্যতম সেরা কোচ কাম ট্রেনার কুন্তল রায় একান্ত সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন অনেক কথা। তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন তা হলো এদেশের ক্রীড়া সংস্কৃতির মান উন্নত করতে হলে

এম এস গিল

সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারের সুস্পষ্ট ক্রীড়ানীতি প্রণয়ন। তার সঙ্গে বিভিন্ন স্বশাসিত জাতীয় ক্রীড়াসংস্থাগুলির ওপর নজরদারি। অর্থাৎ স্পোর্টস ট্রাইবুন্যাল গঠন করা, যাতে এইসব ক্রীড়াকর্তারা দেশের ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। আর তাদেরও দেশের জনসাধারণ ও সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে প্রতিটি আন্তর্জাতিক ইভেন্টের ফলাফলের তারতম্য সাপেক্ষে।

এতদিন তাই যা খুশি তাই করে পার পেয়ে গেছেন এইসব কর্মকর্তারা। খেলোয়াড়দের খেলার মান বাড়ানোর জন্য কিছুই করেননি এরা। এতবড় একটা দেশ, অলিম্পিকে ২/৩টি পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলার যোগ্যতা লাভ করি না। হকিতেও একই অবস্থা হতে চলেছে। অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, সাঁতার তিনটি প্রধান ক্রীড়া ও শরীরচর্চা; যার ওপর সামগ্রিক ক্রীড়া সংস্কৃতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। অথচ এই তিন ইভেন্টের জাতীয় কর্মকর্তারা দিনের পর দিন দুর্নীতি ও নোংরা রাজনীতি করেও টিকে আছেন। খেলা ও খেলোয়াড়েরা চুলোয় থাক, নিজেদের গদি বাঁচিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যবহারিক জীবনে যতরকম সুযোগসুবিধে ও প্রাপ্তিযোগ আদায় করে নেওয়ার জন্যই সংগঠনে টিকে থাকা।

কমনওয়েলথ গেমসের বছরে ক্রীড়ামন্ত্রী গিল তাই এদের সরাতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাদের ক্ষমতায় থাকার সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করার কথা ভেবে ঠিক কাজই করেছেন। আই ও এ-র যুক্তি সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে আই ও এ কে 'ব্যান' করে দিতে পারে বিশ্ব অলিম্পিক সংস্থা বা আই ও সি। তারা মোটেও তা করবে না। কারণ আই ও সি এদেশের ক্রীড়াকর্তাদের প্রকৃত স্বরূপটি খুব ভাল করে জানে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা সরকারি হস্তক্ষেপ আই ও সি-র সনদের পরিপন্থী নয়। তারাও চায় ভারতে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ক্রীড়াসংস্কৃতি।

কিন্তু কোথায় চলেছেন মমতা ব্যানার্জীও?

সেদিন অকলঙ্ক তুষারের গগনভেদী আত্মত্যাগের মতো এ রাজ্যের বেনামী 'লাল-বান্ধবদের' আত্মবিলুপ্তির অশ্রুপাতকে আমল দেননি কংগ্রেসী হাইকম্যান্ডের 'হাইয়েস্ট' কর্ত্রী সনিয়া গান্ধী, কেননা পশ্চাদপদতার গহীন গহ্বরে নিমজ্জিত বাংলা থেকে তার প্রয়োজন ছিল জনাকতক সাংসদ। আজ স্ব-আরোপিত বঙ্গনেতৃত্বের আপাত আবেগময় অজ্ঞতার ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের কাগুজে নেতৃত্ব নকলকেই আসল ভেবে তুলেছে 'আত্মসম্মানের' প্রশ্ন। একথা ভেবে যে, তৃণমূল তার বীজের মতো শেকড় চালিয়ে দিতে পারে লালবাংলার দুর্জয় ঘাঁটিতে এবং মমতা ব্যানার্জীর সবল হাত যাতে নাগাল না পায় লাল হার্মাদদের টুঁটি সেই হিসেব কষে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে শেকড় গজানো সেই 'আমাদের লোক'টির মাধ্যমে দশ নম্বর জনপথের কান ভারী করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সনিয়া সকাশে মমতা ব্যানার্জীর প্রবেশপথ। পরেকার ইতিহাসে বাঙালী সেই ব্রাহ্মণ-তনয় 'আমাদের লোকের' রাশিয়াযাত্রা, বাংলায় তার কয়েকটি নায়েব-গোমস্তা লাল এজেন্টদের আত্মসম্মানের প্রশ্ন উত্থাপন, চব্বিশ প্রহরের জোটের ঘোঁটে বাক্‌বিপ্লবসর্বস্ব সেই নৈবেদিক নামক 'আমাদের লোকের' কুশলী উল্লাস : আমরা জোট চেয়েছিলাম, এখনও চাই, তবে—

তবে, ইতিহাসে রাজারাণীরা আসে, রাজারাণীরা যায়। রাজারাণীরা বদলায় কিন্তু মাটির বুকে মানুষের দিন বদলায় না। স্থানুত্বের কূপবন্দী তাদের বুকে আনে দুঃস্বপ্ন, মনে আনে জড়ত্বের পারাপারহীন অন্ধকার। যেহেতু ইতিহাস চিরকাল এ্যান্টিস্ট্যাটাসকো (স্থিতাবস্থার বিরোধী) এবং সে হচ্ছে চিরকেলে এক ট্র্যাভেলার অব্ জিগ্‌জ্যাগ্ কোর্স (আঁকাবাঁকা পথের যাত্রী)—সেই হেতু ইতিহাসে তাই আওয়াজ ওঠে : পরিবর্তন চাই।....

অতএব, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চল্‌ছে। রাজ্য জুড়ে বদলের ঢেউ। দুর্বিনীত দুরাচারী মিথ্যাচারী সরকারকে বদলে দেবার ঢেউ। মানুষকে, মানুষের অবদমিত প্রতিবাদী সত্ত্বা আর তার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে দেবার ঢেউ। ঐতিহাসিক মার্ক্সীয় বস্তুবাদের পরিবর্তনমুখী যে ঢেউয়ে ঢেউয়ে আদিম সাম্যবাদী সমাজের বদলে এসেছিল যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, সামন্তবাদী সমাজের বদলে এসেছিল যে গণতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজের বদলে এসেছিল যে মার্ক্সীয় সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধারণা—রাজ্যজুড়ে পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়াই চলছে, সেই বদলের ঢেউ-ই উঠ্‌ছে।....

সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো সাড়ে বত্রিশ বছরের রাজার রাজত্বে রাজার অবসাদ, রাজার হাহাকার, রাজার স্থবিরত্বে সবই বদলে যাচ্ছে তার বাক্‌চাতুর্যে, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম বদ্‌লে যাচ্ছে সাজানো মিথ্যার সাথে তার কুশলী ছায়াযুদ্ধে রাজার মতো আদর্শের সাথে চলেছে ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্যে তার জীবন্ত যুদ্ধ। রাজ্যের সাথে দিল্লীর স্বজনদের যুদ্ধ (যেমন বুদ্ধ-করাতের যুদ্ধ)। মন্ত্রীর সাথে আমলার যুদ্ধ (যেমন বুদ্ধ-প্রসাদরঞ্জনের যুদ্ধ)। দাদার সাথে ভায়ের যুদ্ধ (যেমন বুদ্ধ-ক্ষিতির যুদ্ধ)। দলের সাথে জনতার যুদ্ধ (যেমন সিপিএমের সাথে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের যুদ্ধ)। সব যুদ্ধ চলছে। সব যুদ্ধই অবিরাম। অনর্গল। অশ্রান্ত।....

বিশাখা বিশ্বাস

> ”
> **এই পরিস্থিতিতে লজ্জাসরম ত্যাগ করে 'পতিত্যাগী পতিসোহাগিনী সিঁদুরের টিপ বিলাসিনী' নারীদের মতো ডুবন্ত রাজার পার্টীকে আবার কেন ভাসিয়ে তুলতে চাইলো নামহীন গোত্রহীন কুলপরিচয়হীন কংগ্রেসের জনাকতক পরজীবী নেতৃত্ব?**
> “

কিন্তু যুদ্ধ কেন?—না, রাজার শরীরে ফুটে বেরোচ্ছে গুটিবসন্তের মতো মুসলীম সমস্যা, তপশীলি জাতি সমস্যা, গিরিবাসী জঙ্গলবাসীর সমস্যা, বিশেষভাবে খাদ্য, আলো, ঔষধ, বেকারত্ব, 'বিদ্বজ্জন' এবং 'সুশীল সমাজের' সমস্যা—তাই চলেছে কাকে রেখে কাকে ছাড়ার যুদ্ধ। অতএব, একদিন যেখানে গরীবীর সারল্য ছিল জীবনের অলংকার, সেখানে এসেছে প্রতারক প্রমোটারের ঐশ্বর্য-আড়ম্বর। একদিন যেখানে ছিল ছায়াঢাকা ঘুঘুডাকা শান্তি, সেখানে এসেছে অঘোষিত সংঘর্ষ আর সমরায়োজন। যেখানে একদা ছিল সুস্নিগ্ধ সান্ধ্যপ্রদীপলেখা, সেখানে জ্বলছে নিশাচর পিশাচদের রক্তদীপশিখা—খুনীর শরীরে নাচছে রক্তধারা। তাই সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দীক্ষা নিয়ে রাজ্যবাসী আজ চাইছে বদল। সেই বদলের প্রতীকি নাম 'জোট'—জোটবদ্ধ সংগ্রাম।....

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে লজ্জাসরম ত্যাগ করে 'পতিত্যাগী পতিসোহাগিনী সিঁদুরের টিপ বিলাসিনী' নারীদের মতো ডুবন্ত রাজার পার্টীকে আবার কেন ভাসিয়ে তুলতে চাইলো নামহীন গোত্রহীন কুলপরিচয়হীন কংগ্রেসের জনাকতক পরজীবী নেতৃত্ব? সন্ধ্যা হলেই সিপিএমের এক বেনামি চ্যানেলে সুগন্ধী পাউডার মাখা যে কটি বাক্‌সর্বস্ব 'আমাদের লোক' সুচারু বাক্যজালে পরিবর্তনের এই নতুন ধারাকে বিপথে রেখায়িত করতে চান, তাদের নিপাট পাঞ্জাবীর হাত এবং সফেদ শুভ্র ধুতির কাছায় আজকের পারিপাট্য জোটভাঙার পরে স্থিতিশীল থাকবে তো? আমরণ অনশনের ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই যে শৌখিন নেতৃত্বটি সেদিন সন্ধ্যায় সুমধুর মাদরাসিক্ত কণ্ঠে মানুষকে শোনালেন জোটকে অটুট রেখেই জোট ভাঙার তত্ত্ব, তাতে কী বদলপন্থীদের রক্তে লাগবে না অগ্নিজ্বালা? কংগ্রেসী যৌবনেও কী লাগবে না অগ্নিজ্বালা? কংগ্রেসী যৌবনেও কী লাগবে না তীব্র ঘৃণার রক্তধারার নাচন? সেই ঘৃণাতেই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে না আত্মদর্শী রাজার দলতন্ত্রে ক্ষমতান্ধ আস্ফালন, অসহিষ্ণুতার ভয়ংকর অথচ ব্যর্থ হুহুংকার? এবং শূন্য কলসীর উচ্চ আওয়াজের মতোই কী পরিচয় প্রাপ্ত হবে না বঙ্গীয় কংগ্রেসের এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের সকল যুক্তিজাল, বাক্যের চমৎকারিত্ব? কিন্তু, তৃণমূলনেত্রী কোথায় চল্লেন? বর্ণ হিন্দুর গাত্রচর্মে তার পায়ের জুতোর শুকতলা বানাতে বঙ্গীয় তপশীল সমাজের একাংশের হাত ধরে যে মন্ত্রিসভায় একদিন গেছিল সেই পূর্ববঙ্গের যোগেন মণ্ডল, মুসলিমদের লাথি খেয়ে তিনিই ফিরে এসেছিলেন হিন্দু ভারতে। আজ মুসলিম সমাজের হাত ধরে ক্ষমতার কানাগলি বেয়ে যেখানে চলতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জী, যোগেন মণ্ডলের পরিণতি নিয়ে সেখানে থেকেও কী তাকে একদিন ফিরতে হবে না বৃহত্তর হিন্দু সমাজে?—কে জানে।....

সমাবেশ সমাচার

পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবির

উত্তরবঙ্গ পুরোহিত মঞ্চ ও রাধিকালাল পুরোহিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ এপ্রিল কোচবিহারের দিনহাটায় আয়োজিত হয় পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবির। গোপাল ব্যানার্জীর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই শিবিরে পুজোর পদ্ধতি ও সঠিকভাবে মন্ত্রোচ্চারণের ব্যাপারে আলোকপাত করেন মানবেন্দ্র চক্রবর্তী ও মদন আচার্য। ন্যাস-প্রাণায়াম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন ভানু ব্যানার্জী। পুরোহিত মঞ্চের কেন্দ্রিয় কার্যকর্তা মহাদেব গোস্বামীর দীক্ষান্ত ভাষণের মাধ্যমে শিবিরের সমাপ্তি হয়। সবমিলিয়ে জনা-পনেরো শিক্ষার্থী শিক্ষা-গ্রহণ করেন উক্ত শিবিরে। শিবির অধিকর্তার দায়িত্বে ছিলেন পরেশ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য প্রকাশ চক্রবর্তী।

ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ বিরোধী-মঞ্চের কার্যক্রম

ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ বিরোধী মঞ্চের আহ্বানে গত ৩০ এপ্রিল বসিরহাট টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক সনাতন মাহাতো। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট টাউন হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীনিবাস দাস। অনুষ্ঠান শুরুর আগে 'ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ নয়'—এই মর্মে রাজ্যপালের কাছে একটি প্রতিবাদপত্র বসিরহাট মহকুমা শাসকের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ-বিরোধী মঞ্চের আরেকটি কার্যক্রমে গত ২৯ এপ্রিল মেদিনীপুর শহরে জেলা কালেক্টরের দরজায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মনোরঞ্জন কবি, শমিত দাস, অরূপ দাস, শুভজিত রায় প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশের শেষে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও ওই জেলায় মঞ্চের সমর্থকরা ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে পোস্টকার্ড লিখে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকুরিতে মুসলিমদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠাতে শুরু করেছেন।

গত ৩০ এপ্রিল কোচবিহার শহরের সারদানগরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাদেশিক ছাত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, মূলত উত্তরবঙ্গ থেকে সবমিলিয়ে জনা পঞ্চাশেক ছাত্রী কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মহিলা স্ব-শক্তিকরণের পাশাপাশি আজকের সমাজে ছাত্রীদের ভূমিকা ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানে মেয়েদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে অন্যান্যদের সঙ্গে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের রাজ্য সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল ও কোচবিহার গার্লস হাইস্কুলের অবসর-প্রাপ্তা শিক্ষিকা রীণা দে। অনুষ্ঠানে সমারোপ ভাষণ দেন প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী ও যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ২ মে মালদা শহরের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে স্বল্প ব্যয়ে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে বিনা অস্ত্রপচারে একটি ইনজেকশনের মাধ্যমে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে ৪৯ জন রোগীর চিকিৎসা করেন ডঃ ভূদেব সাহা। মালদা সেবা ভারতী পরিচালিত এই একদিনের শিবিরে জেলার দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ যেমন এসেছিলেন, তেমনি মালদা সদর হাসপাতালের এক দন্ত চিকিৎসকও এখানে এসে অর্শ চিকিৎসা করান।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, জেলা সেবা প্রমুখ বিশ্বনাথ মণ্ডল ও প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার।

এছাড়াও সমাজসেবা ভারতীর পরিচালনায় ও সঙ্ঘের সকল কার্যকর্তাদের সহযোগিতায় গত ৪ এপ্রিল পূর্বস্থলী থানার কালেখাঁ তলায় একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ডাঃ বি সি সাহা ইঞ্জেকশান পদ্ধতিতে ৫৮ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশ্বনাথ সাহা।

মঙ্গল নিধি

মেদিনীপুর সদর মহকুমা কার্যবাহ জয়দেব দাস এবং তাঁর স্ত্রী সাথী দাস তাঁদের বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি হিসেবে ১০০১ টাকা সমাজসেবা ভারতীর কাজের জন্য জেলা সঙ্ঘচালক চন্দনকান্তি ভুঁইএঞার হাতে তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা ও মহকুমার কার্যকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গহনা যদি গড়াতে চান যে কোনও স্বর্ণকারকে
স্বপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি -৬

Swastika
24 May - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com